ইসলামের মতানৈক্য পদ্ধতি

ডঃ ত্বাহা জাবির আলওয়ানী

Since 1989

বাংলাদেশ
ইনস্টিটিউট অব
ইসলামিক থ্যট

ইসলামের মতানৈক্য পদ্ধতি

মূল

ড. ত্বাহা জাবির আলওয়ানী

ভাষান্তর

ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

www.pathagar.com

ইসলামের মতানৈক্য পদ্ধতি

মূল : ড. ত্বাহা জাবির আলওয়ানী
ভাষান্তর : ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন

ISBN
984-70103-0015-3

প্রকাশকাল
পৌষ ১৪১৫
মহররম ১৪৩০
জানুয়ারি ২০০৯

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)
বাড়ী # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর #০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ৮৯৫০২২৭, ৯১১৪৭১৬, ০৬৬৬ ২৬৮৪৭৫৫, ০১৫৫৪ ৩৫৭০৬৬
ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৮৯৫০২২৭, E-mail: biit_org@yahoo.com

মূল্য
১২০.০০ (একশত বিশ) টাকা
৪.০০ (চার) ইউএস ডলার

মুদ্রণ
গ্লোবাল ভিশন এন্ড কমিউনিকেশন
৫১, ৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

Islame Motanoikko Poddhoti (Bangali Version of the book **Adabul Ikhtilafi Feel Islam** By : **Dr. Taha Jabeer Al Wany** translated into Bengali by **Dr. A.Y.M. Nesar Uddin**, published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka, Bangladesh, Phone: 8950227, 9114716, 0666 2684755, 01554 357066, Fax : +88-02-8950227, E-mail: biit_org@yahoo.com. Price : Tk. 120.00 (One Hundred and Twenty Taka Only), $ U.S 4.00 (Four).

www.pathagar.com

সূচি

	পৃষ্ঠা নং
ভূমিকা	০৮
প্রথম অধ্যায়	
● মতানৈক্যের হাকিকত ও এর পরিধি	২০
● মতানৈক্য, বিরোধীতা ও বিজ্ঞান	২০
● বিতর্ক ও বিতর্ক বিজ্ঞান	২১
● বিভক্তি	২২
● মতানৈক্যের গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতা	২২
● গ্রহণযোগ্য মতানৈক্যের বিভিন্ন উপকারীতা	২৩
● পরিণতির দিক থেকে মতানৈক্যের প্রকারভেদ	২৪
● ইসলামে মতানৈক্য পদ্ধতি	২৬
● সত্য-ন্যায় বিরোধী মতামতের বিরোধীতা	২৭
● প্রশংসা ও নিন্দার মধ্যে অবস্থিত মতবিরোধ	২৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	
● মতানৈক্যের ইতিহাস ও পরিসীমা	৩১
● রাসূলের (সাঃ) যামানায় সাহাবাগণের মতানৈক্য	৩১
● তাবীল বা ব্যাখ্যা ও তার প্রকারভেদ	৩৩
● নিকটবর্তী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ	৩৪
● দূরবর্তী অর্থ জ্ঞাপনার্থক ব্যাখ্যা	৩৫
● ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ (তাবীল) প্রক্রিয়া বা সংশ্লিষ্টতা	৩৬
● বাতিল ও বর্জিত তা'বীলের প্রকারভেদ	৪০

www.pathagar.com

- মতানৈক্য সম্পর্কে রাসূলের (সাঃ) সতর্কতা ৪৩
- সাহাবীগণের সময়কালে ইখতিলাফের জন্য পরিপালিত নীতিমালা ৪৭
- নবী কারীম (সাঃ)এর ইন্তেকালের পর মতানৈক্য ৪৮
- রাসূলের (সাঃ) দাফন নিয়ে বিতর্ক ৪৯
- রাসূলের স্থলাভিষক্তির (খলীফা নির্বাচন) ব্যাপারে মতানৈক্য ৫০
- যাকাত আদায়ে মতানৈক্য ৫৫
- বিভিন্ন ফিকহী মাসআলাতে (juristic issues) তাঁদের মতানৈক্য ৫৮
- উমর ও আলী (রাঃ) এর মধ্যকার মতানৈক্য ৫৯
- উমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ৬০
- ইবনে আব্বাস ও যায়িদ ইবনে সাবিত ৬২
- যিরার বিন সামুরার স্তুতি ও মুয়াবিয়া (রাঃ) এর ক্রন্দন ৬৬
- খোলাফায়ে রাশেদার জামানায় মতানৈক্যের উন্নত নীতিমালা ৬৭
- তাবেয়ীগণের যুগে মতানৈক্য ও তাদের নীতিমালা ৬৯
- সাহাবায়ে কিরামের উত্তরসূরীগণ ৬৯
- রাজনৈতিক মতানৈক্যের প্রভাব বিশ্বাস ও আইনগত মতপার্থক্যের উপর ৭২
- ইরাকী ও হিজাজী স্কলারবৃন্দ ৭৪
- খারেজীদের সঙ্গে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বিতর্ক ৭৮

তৃতীয় অধ্যায়

- উম্মাহর বিধি-বিধান বাস্তবায়নে মতানৈক্য ৮৪
- ফিকহী মাযহাব সমূহ ৮৪
- প্রসিদ্ধ ইমামগণের নীতি পদ্ধতি সমূহ ৮৫
- ইমাম আবু হানিফা এর নীতি ও পদ্ধতি ৮৬
- ইমাম মালেক এর পদ্ধতি ৮৭
- ইমাম শাফিঈ (রহঃ) এর কর্ম পদ্ধতি ৮৮
- আহমদ ইবনে হাম্বল এর মাযহাবের নীতিমালা ৯০
- ইমাম দাউদ জাহেরী (রহঃ)-এর নীতিমালা ৯১
- আমাদের বক্তব্য ৯২

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

- মতানৈক্যের কারণ ও এর পরিধি ৯৪
- নবুয়তের যুগে মতানৈক্য ৯৪
- ফুকাহাদের সময়কালে মতপার্থক্যের কারণ সমূহ ৯৬
- শাব্দিক অর্থগত কারণ ৯৬
- হাদীস বর্ণনার কারণে মতানৈক্য ১০০
- বিধি-বিধানের মৌলিক পদ্ধতির মাধ্যমে মতানৈক্যের কারণ ১০১
- আইম্মাগণের জ্ঞানের মতানৈক্য ও তাদের শিষ্টাচার ১০২

পঞ্চম অধ্যায়

- ইমাম মালেক (রহঃ)-এর প্রতি লাইছ ইবনে সাদ-এর পত্র ১০৬
- আবু হানিফা ও মালেক (রহঃ) ১০৮
- মুহাম্মদ ইবনে হাসান ও মালেক (রহঃ) ১০৯
- আল শাফীঈ ও মুহাম্মদ ইবনে হাসান (রহঃ) ১০৯
- মালেক ও ইবনে উয়াইনাহ্ (রহঃ) ১১১
- মালেক ও শাফেয়ী (রহঃ) ১১১
- আহমদ ইবনে হাম্বল ও মালেক (রহঃ) ১১২
- ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে আলিমগণের মতামত ১১২
- ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর ব্যাপারে আলিমগণের মতামত ১১৪
- আহমদ ইবনে হাম্বল ও শাফীঈ (রহঃ) ১১৫
- উত্তম যুগের পরবর্তী সময়ের মতানৈক্য ও তার নীতিমালা ১১৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

- চতুর্থ শতাব্দীর পরের অবস্থা ১১৯
- তাকলীদ ও তার পরিণতি ১২৩
- পরবর্তী উম্মাহর অবস্থা ১২৫
- আজকের মতানৈক্যের কারণ সমূহ ১২৭
- মুক্তির পথ ১২৯
- শেষ কথা ১৩২

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি) একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। ইসলামী মূল্যবোধের ওপর ব্যাপক গবেষণা ও প্রকাশনায় এ প্রতিষ্ঠানের বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান ইসলামী মূল্যবোধ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, আক্বীদা, ফিকহ, সমাজ বিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, শিল্পকলা, ব্যবসা-বাণিজ্য সহ ইসলামী চিন্তা-চেতনা সম্পর্কিত প্রায় সকল বিষয়ে গবেষণা ও প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করে আসছে। আইআইটি'র বাংলাদেশের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান হিসেবে অত্র প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকগণের লিখিত বই বিভিন্ন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে গবেষক, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, চিন্তাবিদ ও জ্ঞান পিপাসুদের জন্য বিশেষ সেবার আঞ্জাম দিয়ে আসছে। অত্র বইটি এ কার্যক্রমের অংশবিশেষ।

বিশিষ্ট গবেষক ইসলামী চিন্তাবিদ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক প্রফেসর ড. ত্বাহা জাবির আলওয়ানী কর্তৃক লিখিত আদাবুল ইখতিলাফ্ ফিল ইসলাম বইটি মুসলমানদের অতীত ঐতিহ্য, বর্তমান নানা বিভক্তি এবং মতানৈক্যের ওপর লিখিত। বইটি বিশিষ্ট অনুবাদক, লেখক ও গবেষক ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন 'ইসলামের মতানৈক্য পদ্ধতি' নামে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। বইটি বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের জন্য একটি জরুরি বই। এটি গবেষক, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, বিশেষ করে ওলামায়ে কেরামদের জন্য রেফারেন্স হিসেবে কাজে লাগবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন। *আমীন*॥

মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ
উপ-নির্বাহী পরিচালক
বিআইআইটি, ঢাকা
তারিখ : ২২ জানুয়ারি, ২০০৯

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

আল হামদু লিল্লাহ! বিশ্ববরেণ্য চিন্তাবিদ ও গবেষক ডঃ তাহা জাবির আলওয়ানী কর্তৃক লিখিত 'আদাবুল ইখতিলাফু ফিল ইসলাম' নামক বইটির অনুবাদ সমাপ্ত করতে পারায় মহান রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি। বইটি মূলত ইসলামী উম্মাহর বর্তমান দুরাবস্থার জন্য যে বিষয়টি দায়ী তার আলোচনা দ্বারা লিখিত। অর্থাৎ আজকের মুসলিম বিশ্ব মতানৈক্যের ব্যাধি দ্বারা বহুধা বিভক্ত। পুরো বইতে তিনি এ মতানৈক্যের ধরণ প্রকৃতি ও বাস্তব অবস্থা বর্ণনা করতে ঐতিহাসিক অনেক তথ্য-ত্বত্ত্ব পেশ করেছেন, একই সাথে কুরআন হাদীসের অনেক রেফারেন্স পেশ করেছেন, মণীষীদের নানা উদ্ধৃতি ও অনেক ঘটনার অবতারণা করেছেন। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে বইটি নিঃসন্দেহে একটি গবেষণালব্ধ বই।

সব বইয়ের অনুবাদ এক রকম নয়। এই বইটির বিষয় অনেকটা কঠিন বিষয়ের বিধায় মূল বইতে তিনি যে কথা পাঠককে অনুধাবন করাতে চেষ্টা করেছেন তা অনুবাদে ফুটিয়ে তোলার জন্য আমি চেষ্টা করেছি। অনেক স্থানে অনুবাদ হুবহু না হওয়ার ব্যাপারে এই বিষয়কে সামনে রেখেই অনুবাদ করেছি। আর কুরআনুল কারীমের আয়াতগুলোকে তিলাওয়াতের সাওয়াব পাওয়ার আশায় আরবীর উল্লেখ করার পর বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে।

বিদেশী কোন লেখকের বইয়ের অনুবাদ ইতোপূর্বেও আমি করেছি, তবে এ বইটির অনুবাদ আমি বেশ আন্তরিকতা ও আগ্রহের সাথে করেছি। কেননা, আমার নিজের অনেক অজানা তথ্য এখানে পেয়েছি। পাঠকমন্ডলীর জন্যও আমি এমন আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

ডঃ আলওয়ানীর সাথে আমার সাক্ষাত হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। তাঁর লেখার সাথে সম্পর্ক হওয়ায় যা অনুভব করেছি তাতে একথা বিশ্বাস করতে কোন অসুবিধা নেই যে, তিনি দ্বীনের একজন বড় খাদেম। তাঁর অবদান উম্মাহ'র দুর্দিনে বিরাট কাজে আসবে। এই বই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি এ ধরনের বহু বইয়ের সম্মানিত লেখক ও গবেষক। পাঠকমন্ডলীর নিকট আগামীতে কাজে লাগাবার জন্য পরামর্শ চাই। লেখকের জন্য প্রাণ খুলে দু'আ করার আবেদন জানাই। আমি এই মহান লেখকের বইয়ের নগণ্য অনুবাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাওয়ায় সকলের আন্তরিক দু'আ কামনা করছি। আল্লাহ আমাদের খাইরিয়াত দান করুন।

ডঃ আ. ই. ম নেছার উদ্দিন
ঢাকা
১৪, নভেম্বর-২০০৭

www.pathagar.com

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ, وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَتِهٖ وَ اَهْتَدٰى بِهَدْيِهٖ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، وبعد:

(সকল প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য, দারুদ ও সালাম সাইয়েদেনা মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি; যিনি সর্বশেষ নবী, তাঁর আহলবর্গ ও সাহাবায়ে কিরামগণের প্রতিও দারুদ ও সালাম, আর তাদের প্রতি যারা তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে দাওয়াত কবুল করেছেন এবং তাঁর হিদায়েতে কিয়ামত পর্যন্ত শামিল হবেন।)

মুসলিম উম্মাহ আজকের দিনে নানামুখী ব্যাধিতে আক্রান্ত। এ ব্যাধি তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার সকল দিক ও বিভাগে অনুপ্রবেশ করেছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, উম্মাহ দুনিয়ার বেড়াজালে এমন ভাবে আটকে গেছে যে, তারা তা থেকে বের হতে পারছে না। আল্লাহর শোকর যে, এত কঠিন ব্যাধিগুলোর পরও তারা শেষ হয়ে যায়নি। এসব রোগ ব্যাধির কারণে এবং কোন কোন সম্প্রদায় কর্তৃক ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা সত্ত্বেও তা করতে সক্ষম হয়নি। যদিও তাদের সংখ্যাধিক্য ও বিপুল ধনসম্পদ রয়েছে। কেননা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহর এবং তাঁর নেককার উত্তরসূরীগণের ইসতিগফারে যা পাওয়া যায়। কোরআনের ভাষায়–

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা এমন নন যে, তিনি তাদের কোন শাস্তি দেবেন, অথচ তুমি তখনো তাদের মাঝে রয়েছ, আল্লাহ তায়ালা এমনও নন যে, কোন

সম্প্রদায়ের লোকদের তিনি শাস্তি দেবেন, অথচ তাদের কিছু লোক আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছে। (আনফাল ঃ ৩৩)

মুসলিম উম্মাহর ক্ষতিকর ব্যাধিগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে (ইখতিলাফ) মতানৈক্য ও (মুখালিফাত) বিরোধীতা। এই ব্যাধি তাদের প্রত্যেক অবস্থানে, দেশে দেশে এবং প্রতি সামাজিকতায় অনুপ্রবেশ করেছে, তা বিদ্রোহী আকার ধারণ করেছে, চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাসগত, দূরদর্শীতায়, বিচার ফয়সালায়, ইচ্ছা-আগ্রহে, ব্যয় করার ক্ষেত্রে, আচার-আচরণে, উদ্ভাবনী শক্তিতে, জীবন মানে, কর্মপদ্ধতিতে, বাক্য বিনিময়ে, আশা-ভরসায়, কর্মসূচীতে দূর ও নিকটের সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। এমনকি কালো মেঘ মুসলিম উম্মাহর মনের আকাশে ভাল করে গেড়ে বসেছে, যার বৃষ্টিতে তাদের অন্তর সমূহে এমন বৃক্ষের উদ্ভিদ জন্মেছে, যার মাধ্যমে এমন সব সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছে, যারা পশ্চাৎপদতায় এবং ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়েছে। তাদেরকে পেছনে ফেলে দিয়েছে এবং তারা একে অপরকে হত্যায় মেতে উঠেছে।

অথচ বাস্তবতা এর পুরোপুরি উল্টো। কেননা আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহ এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে না। তাওহীদের পরেই উম্মাহকে যে ব্যাপারে তাগিদ দেয়া হয়েছে তাহলো ঐক্যবদ্ধ থাকা। মতানৈক্য দূর করা এবং মুসলমানের সম্পর্কের স্বচ্ছতাকে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এমন কারণগুলো দূরে রাখা। মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বকে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এমন হুমকী দূর করা। আর এর দ্বারা ইসলামের মূলনীতি, যা হচ্ছে আল্লাহর সাথে শিরক করার বিষয়টির পরেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে উম্মাহর মতানৈক্য ও ঝগড়া বিবাদকে। এটা তাগিদ দেয় যে বিষয়ের দিকে তা হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর পরই গুরুত্ব হচ্ছে উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশনাবলীর মধ্যে এটা রয়েছে যে, মুসলমানদের সারিবদ্ধ রাখা, মনের মায়া মমতা, গভীর গবেষণা এবং পরস্পরের সহযোগিতা করা।

ইসলামে এত তাগিদ আর কোন বিষয়ে যা রয়েছে কালেমাতুত তাওহীদ একত্ববাদের কথার ব্যাপারে এবং ঐক্যবদ্ধতার কথায়। প্রথমটি হচ্ছে আল্লাহর পথে ঈমানের আহবান, যে ঈমান সকল সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে। দ্বিতীয়টি এর সাথে সম্পর্ক যুক্ত। কেননা তাদের রব একজন, নবী একজন, কিতাব এক, কিবলা এক, তাদের জন্ম নেয়ার এবং জীবন প্রণালী এক, সুতরাং কোন

www.pathagar.com

উপায় নেই এটা চিন্তা করা ব্যতিত যে, তাদের কথা ও বাক্য এক ও অভিন্ন হবে।

কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে –

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

"এই হচ্ছে তোমাদের জাতি, এরা সবই একই জাতি, আমি তোমাদের সকলেরই মালিক, অতএব তোমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আমার দাসত্ব করো।" (আম্বিয়া : ৯২)

কিন্তু আজকের মুসলমানদের নিয়ে বড়ই আফসোস! তারা একত্ববাদের কালিমা বাদ দিয়ে দিয়েছে এবং ঐক্যবদ্ধ কালিমা থেকে বিমুখ হয়ে গেছে।

এই বইয়ের মধ্যে যেসব আলোচনা আনা হয়েছে তাতে বিবেকের অংশগ্রহণের তাগিদ দেওয়া হয়েছে, মনের মধ্যে যে মরিচা ধরেছে তা দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। ঈমানের দূরত্বের বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি আনয়নের প্রচেষ্টার কথা বলা হয়েছে। চিন্তা ও উপলব্ধির সকল বক্রতা ও ক্ষতিকারক উপাদানকে সামাজিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সাথে সাথে বিশুদ্ধ চিন্তা-চেতনার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আজকে আমাদের দূর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো উত্তরণের ইঙ্গিত ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে। আমরা এ সময়ের মধ্যে যা অর্জন করেছি তা হচ্ছে, পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, সমালোচনা, মল্লযুদ্ধ, মানদুব, মুবাহ, ফরজ ও ওয়াজিব নিয়ে মতানৈক্য ইত্যাদি। আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি আমরা হারিয়ে ফেলেছি, আমাদের ঐতিহ্য বিনষ্ট করে আমরা অন্যদের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছি। আমরা আমাদেরকে হত্যা ও সংঘাতের দিকে ঠেলে দিয়েছি। যা আমাদের কঠিন জীবনমান উপহার দিয়েছে। আমাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা ও সহমর্মিতার সুগন্ধি দূর হয়ে গেছে। আল্লাহর ভাষায় ঃ

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ
وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

অর্থ : "তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো, নিজেদের মধ্যে পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ করো না। অন্যথায় তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং

www.pathagar.com

তোমাদের প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে। ধৈর্যধারণ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্য্যধারণকারীদের সঙ্গে রয়েছেন।" (আনফাল ঃ ৪৬)
আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে আমাদের শিক্ষা নেয়ার জন্য পূর্ববর্তী ধর্মানুসারীদের কাহিনী বর্ণনা করেছেন এবং সতর্ক হওয়ার জন্য তাদের মধ্যে ক্ষতিকারক দিকগুলো কিভাবে জন্ম হয়েছে এবং কিভাবে তাদের ধ্বংস করেছে তাও বর্ণনা করেছেন। তাদের অনৈক্য ও মতানৈক্যের কারণ ও প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ - مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

"তোমরা কখনো মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ো না, যারা তাদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে, তারা নানা ফেরকায় পরিণত হয়েছে। প্রত্যেকটি দলই নিজেদের নিকট যা আছে তা নিয়ে মত্ত্ব রয়েছে।" (আর-রুম : ৩০-৩১)
একই সঙ্গে আল্লাহ তাদের মতবিরোধকে তুলে ধরেছেন যা তাদেরকে বিভক্ত করেছে। আর বিভক্তি তাদেরকে নবুওয়াতের হেদায়েত থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আর এটা প্রতিরোধক নবীর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার। ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

"যারা নিজেদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে নিজেরাই নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে। তাদের কোন দায়িত্বই তোমার উপর নেই।" (আনআম-১৫৯)

এই বিষয়টি মূলতঃ আহলে কিতাবদের বিষয়, তাদেরকে জ্ঞান কম দেয়া হয়নি, তাদেরকে কোন গোমরাহ পথে প্রদর্শন করা হয়নি। কেন তারা ধ্বংস হলো? এর একমাত্র কারণ, তারা এই জ্ঞান ও ঐতিহ্যকে নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য ও বিদ্রোহের কাজে ব্যয় করেছে। আল্লাহর ভাষায় :

www.pathagar.com

وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ

"যাদেরকে আল্লাহর কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা নিজেরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে মতানৈক্যে লিপ্ত হয়েছিল।" (আলে ইমরান : ১৯)

তাই আমরা কি তাদের ব্যাধির ওয়ারিশ? যা তারা তাদের কিতাবকে পরিবর্তন করার মাধ্যমে লাভ করেছে। আমরা কি তাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেককে পরিবর্তন করে তাদের চরিত্রে যে সব খারাপ উপাদানকে সংযুক্ত করে নিয়েছে তার উত্তরাধিকারী হয়েছি?

মূলতঃ দ্বীনের মধ্যে মতানৈক্য, বিদ্রোহ ও বিভক্তি একটি ব্যাধি আহলে কিতাবদের, যা তাদের ধ্বংসের মূল কারণ। যা তাদের ধর্মকে বিনষ্ট করে ফেলেছে। শুধুমাত্র বাকী রেখেছে তাদের ইতিহাস, যাতে তাদের থেকে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যায়। এটা তাদের জন্য যারা কিতাব ও নবুওয়াতের উত্তরাধিকারী হবে। কেননা মুসলমানদের কোন পরিবর্তন বা বিশ্ব মুসলিমের বিনষ্ট হওয়ার কোন কারণ নেই। তারা হচ্ছে শেষ রিসালতের ধারক-বাহক। আর এই যে ব্যাধি বা রোগ তা শরীরে ধারাবাহিকভাবে লেগে থাকার জন্য নয়। যদি ঐ রোগ নিয়ে সামনে চলে তাহলে তাদের বিপর্যয় হবে। আর বাদ দিলে সুস্থ ও সঠিক পন্থা দ্বারা আরোগ্য লাভ করবে। আভ্যন্তরীণ সকল দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যাবে। আর এটাই হচ্ছে সর্বশেষ রেসালাতের বৈশিষ্ট্য। ইখতিলাফ বা মতানৈক্য বিষয়টি দৃষ্টিকোণের দিক থেকে হয়ে থাকে। বিষয়বস্তুর মাহাত্ম্য অনুযায়ী হয়ে থাকে। এখানে একটি স্বাভাবিক নিয়মকে সামনে রেখে মানুষের চিন্তাশক্তি কাজ করে। আর এটা স্বাতন্ত্র অবস্থা থেকে বৃহৎ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। যখন জীবন পরিক্রমা চলার জন্য প্রয়োজন হয়। এর দ্বারা মানুষের সামাজিক ও আঞ্চলিক দাবী পূরণ করা যায়। আর এর পরিণতিতে পার্থক্য ও পৃথক ধারণার অবতারণা হয়ে যায়। এটা স্বভাবজাত হতে পারে বা উদ্ভাবিত প্রক্রিয়ায় হতে পারে। ফলে কর্মপদ্ধতির মধ্যে এর প্রভাব ও ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। মানুষের জন্য সেটাই সহজ হয় যার জন্য তাকে আল্লাহ সৃজন করেছেন। এসব কারণে আমরা দেখি মানুষ বিভিন্ন প্রকার ও প্রকৃতির হতে পারে। কিন্তু যারা মুমিন তারা একটি স্বতন্ত্র পদমর্যাদা লাভ

www.pathagar.com

করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের নফসের উপর নিজেই অত্যাচারী হয়, আবার কেউ কেউ মধ্যপন্থী হয়, আবার কেউ কেউ সৃষ্টির সনাতনী অবস্থায় কল্যাণের উপর টিকে থাকে।

আল্লাহ বলেন–

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

'তোমার রব ইচ্ছা করলে মানুষকে একই উম্মত বানিয়ে দিতে পারতেন। এ কারণেই তারা নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করতে থাকবে।' (হুদ ঃ ১১৮)

আফসোসের বিষয় হচ্ছে, মুসলমানদের মতানৈক্য জ্ঞানের উর্বরতা ও গভীর বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমেই হওয়ার সূত্রপাত হয়, কিন্তু কালক্রমে তা একধরনের পেশীশক্তির প্রতিযোগিতার পর্যায়ে রূপ লাভ করে এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিবাদ, বিভক্তি, পশ্চাৎপদতা এবং হত্যা-সংঘাতের দিকে মুসলমানরা নিপতিত হয়। এমনকি শেষ পর্যন্ত সৌজন্যতার সকল সীমা অতিক্রম করে প্রভাব বিস্তারের এমন এক পর্যায়ে চলে যায় যে, এক পক্ষকে কেউ আক্রমণ করলে তাকিয়ে তামাশা দেখাকে শ্রেয় মনে করে। দ্বীনের শত্রুরা এবং আহলে কিতাবরা মুসলমানদের চেয়ে কাছে অবস্থান করে। আর এর ফলে দূর ও কাছের ইতিহাস খোঁজ করলে এমন দুঃখজনক অনেক ঘটনাবলী আমাদের সামনে এসে যায়। বর্ণিত হয়েছে যে, ওয়াসিল ইবনে আতা তার বন্ধুদের একটি দলসহ আসলেন, তাদের খারেজী সম্প্রদায় আটক করল। ওয়াসিল বললেন, এটা তোমাদের জন্য উচিত নয়। তোমরা তাদের ছেড়ে দাও। আমাকেও ছেড়ে দাও। তারা এতে সম্মত হয়ে বলল, তুমি কে, তোমার সাথীগণ কে? বললেন, তারা মুশরিক প্রতিবেশী। যারা আল্লাহর কালাম শুনতে চায় এবং তার দন্ডবিধি জানতে চায়। তারা বলল, আমরা আপনাকে আমাদের প্রতিবেশী বানালাম। বললেন, আমাদেরকে শিক্ষা দিন যাতে করে তার আহকামগুলো শিখতে পারি। অবস্থা এমন হলো যে, তারা আমাকে ও সাথীদের চুম্বন করতে থাকল। তারা বললো, তোমরা আমাদের সাথী হয়ে থাক। কেননা, তোমরা আমাদের ভাই। তিনি বললেন- এটা তোমাদের জন্য নয় (এটা আমাদের দায়িত্ব)। কেননা আল্লাহ বলেন– 'যদি কোন মুশরিক তোমার নিকট আশ্রয় চায় তাহলে তাদের আশ্রয় দাও। যাতে সে এর মাধ্যমে

www.pathagar.com

আল্লাহর বাণী শুনতে পায় অতঃপর তাকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেবে।' (তাওবাহ-৬)
এরপর আমরা তাদের নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিলাম। তারা একজন আরেকজনের দিকে তাকাতে থাকল। তারা বলল সত্যিই এটা তোমাদেরই কাজ। নিরাপদে পৌঁছা পর্যন্ত তারা চলতে থাকল। (আল কামিল ফিল লুগাতি ওয়াল আদাবিল মুফরাদ ২য় খন্ড পৃঃ-১২)
এই ইখতিলাফের বিষয় অত্যন্ত অযাচিত। এখানে মনের খামখেয়ালীপনা এমনভাবে বিস্তার লাভ করেছে যে তা দ্বীনের একনিষ্ঠ নির্দেশনাবলীর উপর বিজয়ী হয়ে গেছে। ফলে তাদের অন্তরে নানা বিভ্রান্তি গেড়ে বসেছে। তারা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির উপর প্রাধান্য বিস্তারে লোভী হয়ে পড়েছে। এমনকি তারা কলেজ ইউনিভার্সিটি থেকে লব্ধ জ্ঞানকে বেমালুম ভুলে গিয়ে এই মতানৈক্যের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে গেছে। ইসলামের মৌলনীতি পদ্ধতিকেও ফলে তারা ভুলে গেছে। অন্যদিকে এর ফলে তারা চক্ষুষ্মান সাথী ও বন্ধুবান্ধব হারিয়েছে। তারা জ্ঞানভিত্তিক কাজের পরিবর্তে বিনা জ্ঞানে ফতওয়া দেয়াকে সহজ জ্ঞান করে নিয়েছে। আলোকজ্জ্বল আমলের পরিবর্তে দলীলবিহীন কাজে লিপ্ত হয়েছে। তারা তাদেরকে ফাসেকী, কুফুরী ও অন্যায় কাজের মতবাদের দিকে প্রসারিত করেছে। ফলে তাদের অন্ধত্বতুল্য ব্যাধিতে পেয়ে বসেছে। দুনিয়াকে তারা অন্ধকার দেখে, তাদের চারপাশে শুধু অন্ধকার ও কালো প্রত্যক্ষ করে। অথচ মুসলমান হিসেবে তাদের জন্য এর উল্টোটি হওয়ার কথা। আল্লাহ বলেন–

وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُور

"বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালা যার জন্য কোন আলো বানাননি তার জন্য তো কোন আলো (নূর) থাকবে না।" (আন নূর : ৪০)
তাছাড়া এ অবস্থায় গবেষণা ও ফিকহী শিক্ষা ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন হয়ে গেছে। সাধারণ ও আনাড়ী মানুষদের হাতে এসব গিয়ে পৌঁছেছে। ফলে চিন্তার পদস্খলন ঘটেছে। কুরআনের আয়াত ও হাদীস রাজনৈতিক জটিলতায় অপব্যবহার হয়ে চলেছে। আর এতে করে কুরআনের আয়াত ও হাদীস সমূহ তাদের সুগন্ধ ও রং হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয়ে পড়েছে। যারা এ কাজটি

www.pathagar.com

করে তারা কিভাবে মুসলমানের বন্ধু হতে পারে। আমাদেরকে এ ক্ষেত্রে যেন স্মরণ করিয়ে দেয় আরবের প্রবাদবাক্য :

كَذَّابُ رَبِيْعَةُ أَفْضَلُ مِنْ صَادِقٍ مُضَرٍ

"মুদার গোত্রের সত্যবাদীর চেয়ে রবীয়াহ গোত্রের মিথ্যুক উত্তম।"

আমাদের পূর্বপুরুষ সলফে ছালেহীনগণ যে ইখতিলাফ করেছেন তাতে এমন কারণ ছিল না যে, তারা তার জন্য বিভক্ত হয়ে গেছেন। তাদের কথা, কাজ, কর্মসূচী ও মন সবই ঐক্যবদ্ধ ছিল। রাসূল (সাঃ) তাদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তারা এমন মানুষ ছিলেন কোন মুসলমানের জন্য কোন খারাপ চিন্তা নিয়ে তারা ঘুমাননি। আর আমরা আজকের মুসলমানরা? আমাদের নিজের মধ্যে ও আমাদের মনের মধ্যে বিপর্যয়। আর এজন্য প্রকাশ্য ঐক্য ও দাওয়াতের মহান বিষয়টি যেন আমাদের নফসের সাথে একধরনের প্রতারণা। অথচ আল্লাহ বলেন ঃ "তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুণাহ বাদ দাও।" (আনআম : ১২০)

আমাদের আজকের সমস্যা চিন্তার সমস্যা। আমাদের বিপদ জ্ঞানের সমস্যা। আর মুসলিম বিশ্ব যখন তাদের জ্ঞানকে উৎসর্গ করেছিল তারা উন্নত রাজনৈতিক বিধি-বিধান দ্বারা তাদের জীবনকে পরিচালনা করেছে। কিতাব-সুন্নাহ ও রিসালাতের আলোকে তাদের সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ফলে কঠিন বিষয় সহজে লাভ করেছে। কিতাব ও সুন্নাহকে তারা বিবাদ ও বিভক্তিতে ব্যবহার করেননি। আল্লাহ বলেন-

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

"তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য পোষণ কর। ঝগড়া-বিবাদ করোনা, যদি তা করো তোমরা সাহস হারা হয়ে পড়বে এবং তোমাদের যে প্রতিভা রয়েছে তা শেষ হয়ে যাবে।" (আনফাল : ৪৬)

ইসলাম আজ এসে থমকে দাঁড়িয়েছে পরনিন্দা, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের বেড়াজালে। যে আরবরা একদিন এক ইলাহর জন্য নিজেদেরকে নিবন্ধ করেছিল তারা আজ স্ব-স্ব গোত্রের জন্য এক এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। আজকের দিনে মুসলমানরা সম্পদ ঘাটতির অভিযোগ করে না। অথবা খারাপ জীবনযাত্রার অভিযোগও নয়। তাদের একমাত্র অভিযোগ চিন্তার ঐক্য অথবা দ্বীনি প্রবাহ নিয়ে। তাদের ব্যাধির আসল আরোগ্য নিয়েই অভিযোগ। এর অর্থ

www.pathagar.com

ঐক্যবদ্ধতা, সুষ্ঠু বন্টন ও এক লক্ষ্য স্থির করা। এর অভাবে তারা আজ বড় বড় বিধিবিধান থেকে বঞ্চিত। তাদের উপর নেমে এসেছে নানা ত্রুটি এবং চিন্তার সংঘাতের রীতি।

এর থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হচ্ছে তাদের চরিত্রকে সংশোধন করা, ব্যবহার সঠিক জায়গায় নিয়ে আসা। এটা করা গেলে চিন্তার বিশুদ্ধতা ও কর্মসূচী বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং এটা ছাড়া কোন উপায় নেই। হারানো গৌরব আর কোন মতে ফিরে আসার পথ নেই। আগামী প্রজন্মের জন্য এটাই এখন বড় প্রশিক্ষণ হওয়া দরকার। আমাদের পূর্বসূরীরা যেভাবে কিতাব ও সুন্নাহকে শক্ত ভাবে আঁকড়ে ধরেছে এবং সে অনুযায়ী চরিত্র গঠন করেছে এবং শিষ্টাচার শিক্ষা করেছে তাতে ফিরে আসা ছাড়া অন্য কোন পথে মঙ্গল নিহিত নয়।

যখন আমি সম্মানিত পাঠকবৃন্দ সমীপে এই পুস্তকটির তৃতীয় সংস্করণ পেশ করছি তখন গুরুত্বপূর্ণ কিছু উত্তর প্রদান ও দায়িত্ব অর্পণের প্রতি ইঙ্গিত করা কর্তব্য। সুধী পাঠকবৃন্দের পক্ষ থেকে সরাসরি যে সমস্ত চিঠিপত্র পেয়েছি ও আমার সাথে তাদের আলোচনা এবং এই পুস্তকটি সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় যে সমস্ত লেখালেখি হয়েছে অথবা এর সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা সভা ও উন্মুক্ত ক্লাসে যে সমস্ত আলোচনা হয়েছে তার আলোকে :

১. বিপুল সংখ্যক পাঠক এই পুস্তকটিকে সাদরে গ্রহণ করেছেন ও একে উষ্ণ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছেন এবং অনেক মুসলমান এই পুস্তকটিকে তাদের ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশনার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাই আমি যারা এই দায়িত্বটি স্বেচ্ছায় পালন করতে ইচ্ছুক তাদের প্রত্যেককেই এর অনুমতি প্রদান করলাম। সম্ভবত বইটি এ পর্যন্ত তিনটি ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

২. করুণ পরিণতির গভীরতা সম্পর্কে জ্ঞাত আগ্রহী একটি দল আশা প্রকাশ করেছেন যে, এই পুস্তকটিকে যদি বর্তমান মুসলিম জগত নিয়ে আলোচনা করা হতো এবং সমকালীন মতবিরোধ সমূহের নিষ্পত্তি ঘটাতো যার কারণে এক ইসলামী আন্দোলন নিয়ে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে তেরানব্বইটি আলাদা আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে যা একটি হতে আরেকটি পুরোপুরি স্বতন্ত্র। এর কারণ হলো অসচেতনতার অন্তরায়, মেধা শক্তির দূর্বলতা এবং বিভিন্ন প্রকার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার ঘৃণ্য

www.pathagar.com

কুয়াশা এমন আকার ধারণ করেছে যে, নরম কথা সমূহ সেটি ভেদ করে তাদের আবৃত কোমল হৃদয়ে পৌঁছাতে পারে না।

এ সত্ত্বেও আমি দৃঢ় আশাবাদী যে, ইসলামপন্থীদের অন্তরে আগ্রহের উদয় হবে সমঝোতা ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং তাদের মতানৈক্যের প্রভাব হতে উত্তরণের। আর তা যদি না হয় তাহলে আমি এখনও আশংকা প্রকাশ করবো যে, অজ্ঞরা এখনও অজ্ঞই রয়ে গেছে, বিজয়ীরা এখনও বিজীতদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে, শত্রুতাপোষণকারীগণ এখনও ওঁৎ পেতে বসে আছে এবং ষড়যন্ত্রকারীগণ এখনও ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে রেখেছে। আমি চাই এই সমস্ত শিষ্টাচার সমূহকে বাস্তবতার নিরীখে দাঁড় করাতে এবং আমার মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে সমসাময়িক ইসলামপন্থী দলগুলোর অবস্থান প্রকাশ্যে ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে চাই। যেন ইসলামী অঙ্গন এরপর তার জন্য প্রস্তুত না হয়। কিন্তু মুসলিম যুবকদের অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত করার সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, এই শিষ্টাচার সমূহ সম্পর্কে তাদের প্রত্যেকের জ্ঞানের আলোকে এ জাতীয় শিক্ষা তাদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়াই এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ী হবে- এই জাতীয় পদক্ষেপের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের উপর ফয়সালা।

৩. অন্য আরেকটি একনিষ্ঠ দল আশা প্রকাশ করেছেন যে, যদি পুস্তকটি আরও বড় হতো, এখানে আরও বেশীসংখ্যক মডেল অন্তর্ভূক্ত করা হতো এবং অন্যান্য ইসলামী মাজহাব থেকে ইখতিলাফের আদবসমূহ বা মতানৈক্যের শিষ্টাচার সমূহ গ্রহণ করা হতো। এটা একটি যথার্থ প্রস্তাব, আমরা আশা রাখি যে পরবর্তী সংস্কার সমূহে আমরা এটা করতে সক্ষম হবো- আল্লাহ পাকের ইচ্ছায়। আমি যা উপস্থাপন করেছি শুধু সেটাই পড়তে হবে এবং একে ব্যাপক একটি বিষয় হিসেবে গণ্য করতে হবে সে ইচ্ছা আমি পোষণ করিনি, বরং আমি আদাব বা শিষ্টাচার সমূহের মধ্য হতে নির্ধারিত কিছু মডেল উপস্থাপন করতে চেয়েছি, যা অন্যান্যগুলোর প্রতি সতর্ক করে দেবে এবং এর সমকক্ষ যেগুলো আছে সেগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করবে।

৪. অপর আরেকটি একনিষ্ঠ দল প্রস্তাব করেছেন যে, যদি বইটিকে একাডেমিক ফেকহী বৈশিষ্ট্য থেকে বের করে উম্মাহর সমস্ত বিশিষ্ট আলেম-ওলামার মাঝে মতানৈক্যের শিষ্টাচারসমূহ উপস্থাপন করা হতো,

www.pathagar.com

হোক তারা এর মধ্য হতে ইসলামের কাতারের সাথে সম্পৃক্ত অথবা আধুনিকতারও ব্যাপক সংস্কারের চিন্তাধারার সাথে। বিশেষ করে ঐ সমস্ত দল যারা এখনও ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি এবং ইসলামকে মূল জাতির একটি অংশ হিসেবেই বিবেচনা করে। এর প্রত্যেকেই যে বিষয়টির প্রতি আহবান করে, তাহলো উম্মাহকে ঐ যুগে প্রবেশ করানো যে যুগে তারা বসবাস করে এবং তারা সভ্যতার ক্রমবিকাশকে জাতীয়তাবাদের কাঠামোর সাথে জুড়ে দিয়েছেন এই ধারণা পোষণ করে যে, তা জাতির অংশকেই প্রশস্ত করবে।

আর প্রকৃতপক্ষে আমি দেখছি যে, এটা সত্য এবং এ ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রচেষ্টা ব্যয় করতে হবে। এর কারণ হলো মতানৈক্যের শিষ্টাচার সমূহ শেখা এবং সমস্ত জাতির বিশিষ্ট আলেম-ওলামার মূলনীতি সমূহ আয়ত্ব করা এবং এর প্রতি খেয়াল রেখে জাতির সন্তানদেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার মাধ্যমে জাতির প্রচুর শক্তি অচিরেই সংরক্ষিত হবে। দিন দিন অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের নাট্য মঞ্চে অপচয় ও ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।

নিশ্চয়ই মুসলিম বুদ্ধি-বিবেক যখন তার সভ্য ভূমিকা অনুধাবন করতে পারবে তখন সে দ্রুত উম্মাহর আত্মভোলা সন্তানদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য সর্ব প্রচেষ্টা ব্যয় করবে। আর ইসলামপন্থীগণ হলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত মুসলিম উম্মাহকে ঐক্য ও সংহতির দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য যথাযথ ভিত্তি নির্মাণের জন্য। সহায়ক সভ্য চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, এর ভূমিতে সভ্যতা নির্মাণের জন্য। নিশ্চয়ই জীবন ও মৃত্যুর মাঝে যে জিনিসটি পার্থক্য করে দেয় তাহলো একটি মূহুর্ত। আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় যখন সত্য হবে, তখন আমাদের ও আমাদের পুনরুত্থানের মাঝে কোন অন্তরায় থাকবে না। শুধুমাত্র আমাদের ঐ সমস্ত সন্তান ও ভাইগণ যাদেরকে শয়তান পুরোপুরি বশীভূত করে নিয়েছে। আল্লাহ পাকের সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে মুমিনগণ খুশি হবেন এবং যারা নাকোচ করে দিয়েছে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

৫. আমার জানা মতে এখানে অত্যন্ত ক্ষীণ একটি দল আছে, যারা এ জাতীয় পুস্তকের প্রকাশনাকে নাকোচ করে দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, মুসলমানদের জন্য মতানৈক্যের সৃষ্টি করা মোটেও উচিত নয়। আর

www.pathagar.com

যখন তাদের মাঝে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে তখন মতানৈক্য হারাম ঘোষণা করা, একে কুফুরী করার জন্য সন্নিবেশিত করা ও সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে তাকে প্রতিহত করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে, মতানৈক্যের শিষ্টাচার নিয়ে আলোচনা করা ও প্রতিষ্ঠিত করা তাকে স্বীকৃতি প্রদান করার শামিল।

আমি জানি না এই প্রেক্ষাপটে এসে তাদের উদ্দেশ্যে আমি কী বলবো, শুধুমাত্র মানুষ কতটা আত্মভোলা হতে পারে যে, সে সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি সমূহকে অস্বীকার করতে অথবা ভুলে যেতে পারে তা দেখে হতভম্ব হওয়া ব্যতিত। যখন আমি আমীরুল মু'মিনীন আলী রাযি আল্লাহ আনহুর দূর্ভোগের কথা অনুধাবন করতে পেরেছি যখন তিনি বলেছিলেন "যখন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি আমার সাথে ঐক্য করেছে তখন আমি বিজয়ী হয়েছি আর যখন কোন মূর্খ ব্যক্তি আমার সাথে তর্ক করেছে তখন তার কাছে আমি পরাজিত হয়েছি।" আমি সর্বাবস্থায় আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালার কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি এই দলটিকে এবং আমাদেরকেও সত্য ও সঠিক পথের দিশা দেন।

অতঃপর আমাদেরকে "ইসলামাবাদ সংস্কৃতি" সিরিজের অন্তর্ভূক্ত এই পুস্তকটির নতুন সংস্করণ পাঠক সমীপে উপস্থাপন করার পথ সুগম করে দিয়েছে প্রয়োজনীয়তার প্রতি সাড়া প্রদানের জন্য ও শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য। আশাকরি, সম্মানিত সুশিক্ষিত মহল, আমি যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছি তার প্রস্তাব যারা সাদরে পেশ করেছেন তাঁরা একে পাঠ করবেন। পুস্তকটি যে বিষয়ের সূত্রপাত করেছে তার বাস্তবায়নেও অংশগ্রহণ করবেন। এর লেখক যে সমস্ত বিষয় বাদ দিয়ে গেছেন তা পূর্ণ করার জন্য আলোচনার মাধ্যমে মূলনীতি প্রতিষ্ঠায় এবং মজবুত পাটাতনে ও শক্ত মাটিতে মতানৈক্যের সহায়ক শিষ্টাচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সফল হবেন। আল্লাহ পাকই সঠিক পথের প্রদর্শক।

ওয়াশিংটন
১৪০৭ হিজরী
ফেব্রুয়ারী-১৯৮৭ইংরেজী।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

মতানৈক্যের হাকিকত ও এর পরিধি

মতানৈক্য, বিরোধীতা ও বিরোধীতা বিজ্ঞান, বিতর্ক ও বিতর্ক শাস্ত্র, বিভক্তি

মতানৈক্য ও বিরোধীতা এমন একটি বিষয় যা কোন ব্যক্তিকে একটি ভিন্ন মতে ও অবস্থানে নিত করে। অন্যকথায়, বিরোধীতা বিপরীতার্থক একটি সাধারণ শব্দ বিশেষ। কেননা মতদ্বৈততা দুটি ভিন্নমাত্রিক হয়ে থাকে। তবে সকল মতবিরোধ দুটি অবস্থা বা দুটি পক্ষ নাও হতে পারে। আর যখন মতবিরোধ মানুষের মধ্যে সাধারণ হয়ে যায় তখন তা ঝগড়া ও বিতর্কের পর্যায়ে চলে যায়। আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেন–

فَاخْتَلَفَ الأحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ

"এরপর তাদের দলগুলো নিজেদের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি করলো অতপর অস্বীকার করলো, তাদের জন্য রয়েছে এক কঠিন দিনের দুর্ভোগ।" (মারইয়াম:৩৭)

وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

"এ কারণে তারা হামেশাই মতবিরোধ করতে থাকবে।" (হুদ : ১১৮)

إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ

"তোমরাও নানা কথাবার্তার (মতবিরোধ) মধ্যে রয়েছে।"(আয যারিয়াত : ৮)

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

"অবশ্যই আপনার রব কিয়ামতের দিবসে ফয়সালা করে দেবেন সেসব বিষয়ে যা নিয়ে বিভেদ করত।" (ইউনুস ঃ ৯৩)

এ অবস্থায় এটা সম্ভবপর বিষয় যে, মতানৈক্য ও বিরোধীতা কথা, মতামত, অবস্থান ও নীরবতার জন্য বিপরীতার্থক বুঝায়।

বিতর্ক শাস্ত্র বিশেষজ্ঞগণের নিকট এমন বিষয় হিসেবে পরিচিত যা দ্বারা ইমামগণের কোন একজনের মতামত অনুযায়ী তা সাব্যস্ত হতে পারে। বিরোধীদের মতামতকে এক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট দলীল দ্বারা খন্ডন করা যায়। যদি এক্ষেত্রে কোন দলীল না পাওয়া যায় তাহলে গবেষক (মুজতাহিদ)ও নীতিশাস্ত্র (অসুল) দ্বারা সাব্যস্ত করা হয়। মতবিরোধের জন্য এটাও অত্যাবশ্যক যে,বিষয়টির আলোচনা ফিকহের দলীলের মধ্যে সীমিত থাকবে। শুধু তাই নয় এর উপর দৃঢ় থাকা হবে যে, স্বপক্ষের ইমামের এ বিষয়ে হুকুম বা রায় বিদ্যমান থাকবে। আর সে রায়টি হবে ব্যাখ্যা সাপেক্ষে। তার ইমামের জন্য (মতবিরোধকারীর) বিবেচনায় যা আসবে তা তার স্বপক্ষেও ইমামের দলীলকে খন্ডন বা বিরোধীতা করার ব্যাপারে অন্য ইমামের দলীল সে পর্যন্ত হওয়ার মত অবস্থায় থাকবে।

বিতর্ক ও বিতর্ক বিজ্ঞান

বিতর্কিত দু'পক্ষের কোন পক্ষ বা উভয় পক্ষ যখন শক্ত অবস্থানে অবস্থান করে কথা, মতামত বা নীরবতা পালনের মাধ্যমে, আর তাতে দলগত আধিক্য পরিলক্ষিত হয়,একে অন্যের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে এমনকি অপর পক্ষের দিক থেকে আক্রমণ হওয়ার পর্যায়ে চলে যায়। এ অবস্থাকে বিতর্ক বলে আখ্যায়িত করা হয়।

বিতর্ক (جدال) শব্দগতভাবে যা অত্যাবশ্যকীয় করে দেয় ঝগড়া ও বিজয়কে এটা থেকে নেয়া হয়েছে। যখন তা ছিঁড়ে যায় বা ছিঁড়ে ফেলার জন্য নির্দেশ দান করে। কেননা, বিতার্কিক দু'পক্ষ এমন অবস্থানে থাকে যে, তার প্রতিপক্ষকে সে ঘায়েল করতে চায়। তার সর্বশক্তি দিয়ে সে তর্কে অবতীর্ণ হয়। তার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়ার জোর প্রচেষ্টা চালায়।

আর বিতর্ক বিজ্ঞান হচ্ছে এমন বিষয় যা ফিকহী বক্তব্যকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য দালিলীক মোকাবেলা দ্বারা কোন মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করা।[১]

কোন কোন আলিমগণ সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে এমন শাস্ত্র যা সক্ষম করে দেয় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোন বিষয়কে যদিও তা বাতিল হউক, আবার নিঃশেষ করে দেয় যদিও তা সত্যসত্যি হউক।[২]

এই সংজ্ঞার আলোচনায় শব্দগত সংজ্ঞার দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। কেননা এসব আলোচনা অকাট্য দলীলের সাথে প্রণীত নয়। বরং এটি হচ্ছে এক

www.pathagar.com

ধরনের শক্তি ও সামর্থের আলোকে কোন মানুষকে প্রভাবিত করে, যদিও কুরআন ও হাদীসের কোন সূত্র বা এতদুভয়ের সমার্থক কোন সূত্র দ্বারা তা সিদ্ধান্ত না হয়।

বিভক্তি

যখন দু'পক্ষ বিতর্ককারীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ কঠোরতর হয়। পক্ষদ্বয় জয়কে দৃশ্যতঃ হক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেয়ে বেশী প্রাধান্য দেয় এবং উত্তম পরিণতির বিপরীতে অবস্থান নেয়। তাদের দু'পক্ষকে বুঝিয়ে বা ঐক্যমত্যে নেয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে এ অবস্থাকে বিভক্তি বলা হয়। আর মূলতঃ কোন জমিনের পূর্ণাংশ বা অর্ধেক অথবা এক পাশে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার জন্য দু'পক্ষ চেষ্টা করে। কিন্তু জমিনতো তাদের দাবী মত প্রসারিত হয় না। কুরআনুল কারীমের ভাষায় :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا

"আর যদি তাদের দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা দেখা দেয়।"(নিসা:৩৫)

অর্থাৎ পারস্পরিক কঠিন বিরোধীতা তাদেরকে এমন পরিণতির দিকে নিয়ে যায় যা বিবাদের রূপ পরিগ্রহ করে। আর এতে উভয় পক্ষ কঠিন বিভক্তির দিকে ধাবিত হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ

"তারা অবশ্যই উপদলীয় অনৈক্যের মধ্যে পড়বে।" (বারাকাহ –১৩৭)

মতানৈক্যের গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতা

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে জ্ঞান ও উপলব্ধি শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে বাকশক্তি, রং, দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তার বিভিন্নতা রয়েছে। আর এসব কিছু বায় বা মতের ও সিদ্ধান্তের সংখ্যাধিক্যের দিকে ধাবিত করে। সাথে সাথে তাদের কথা বিভিন্নতাও দেখা যায়। মুখের আওয়াজ ও রংয়ের পার্থক্য যখন চিহ্নিত হয় তখন স্বাভাবিক ভাবে আল্লাহর নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত হয়। যদি উপলব্ধি ও

www.pathagar.com

জ্ঞানের বিভিন্নতা হয় এবং এগুলোর ফলাফলে যা দাঁড়ায় সে গুলোও আল্লাহর নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত হয়। আর তা আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহর অস্তিত্ব, নির্মাণশৈলী ও জীবন দানের কোন বিশ্লেষণ করা হয়, তাতে অনুমিত হয় যে, এত সব সৃষ্টি করা যায় না যদি তিনি সকল মানুষকে একই নিয়মে তৈরী করতে না পারেন। আর এ জন্যই এত সব সৃষ্টিকূল সৃষ্টি করা তার জন্যই সহজ। আল কুরআনের ভাষায়–

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"আপনার রব চাইলে দুনিয়ার সব মানুষকে তিনি একই উম্মত বানিয়ে দিতে পারতেন, এ কারণে তারা হামেশাই নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করতে থাকবে। তবে আপনার রব যাদের ওপর দয়া করেন তাদের কথা ভিন্ন তাদের তো এজন্যই আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন।" (হুদ ঃ ১১৮-১১৯)
অবশ্যই একথা জোর দিয়েই বলা চলে যে, যে সকল মতবিরোধ এ উম্মতের মধ্যে ঘটেছে, তা এমন কোন ঘটনা ছিল না যা এই সব স্বাভাবিক দিকগুলোর প্রকাশ ঘটেনি। যদি তাদের মতবিরোধ সীমা অতিক্রম না করত এবং শিষ্টাচারের প্রয়োগ থাকত তাহলে তাদের এ ধরনের মতানৈক্য অনেক ফলদায়ক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতো।

গ্রহণযোগ্য মতানৈক্যের বিভিন্ন উপকারীতা

আমাদের পূর্বসুরীদের মত আমরাও অনুসরণ করতে পারি। কেননা তারা মতানৈক্যের সীমালংঘন করেননি, মতানৈক্যের নীতি ও শিষ্টাচার ভঙ্গ করেননি, যা কিনা তাদের জন্য বিভিন্ন উপকার ও সুফল নিয়ে এসেছে। যেমন–
ক. এটি শক্তিশালী করে তোলে যদি উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। ঐ সকল অবলম্বন গুলোর উপর সম্যক ধারণা লাভ হয়ে থাকে যা স্ব-স্ব অবস্থানের প্রতি বিপরীত দিক থেকে আরোপ করা হয়, আর তা বহুবিধ প্রমাণ বা দলীল সমূহের মধ্যেই আবর্তিত হয়।

www.pathagar.com

খ. মতবিরোধ যদি গুণগত মান সম্পন্ন হয় (যা উপরে বর্ণিত হয়েছে) তাতে জ্ঞানের চর্চা হয়, সিদ্ধান্তের জন্য উপযুক্ত করে দেয়। মৌলিক নীতিমালার জন্য চিন্তার দরজা খুলে দেয় ঐ সমস্ত বিষয়বলীর জন্য যা বিভিন্ন চিন্তার উদ্ভব দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

গ. প্রত্যেক ঘটনাবলীকে সহজতর করে দেয় যেন সম্ভাব্য সমাধানের পথ নির্দেশনা পাওয়া যায় এর জন্য উপযুক্ত হয়। আর এ দ্বীনকে (ইসলাম) সহজ করে যা মানুষের সাথে দৈনন্দিন ব্যবহৃত হয় তাদের জীবন চলার পথে।

এই সকল উপকারীতা এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক উপকারীতা লাভ করা তখনই সম্ভব পর হয় যখন মতানৈক্যটি সীমার মধ্যে অবস্থান করে এবং শিষ্টাচারপূর্ণ হয়। যা তার প্রতি আকৃষ্ট ও সন্তুষ্ট থাকার জন্য উপাদেয় হয়ে থাকে। কিন্তু যদি সীমা লঙ্ঘিত হয় এবং শিষ্টাচারের কোন সৌন্দর্য্য থাকে না তখন তা ঝগড়া বিবাদ ও বিভক্তিতে রূপ নেয়। যা একটি খারাপ পরিণতির দিক ধাবিত করে। উম্মাহর মধ্যে অশান্তির জন্ম দেয়। ফলে যা হবার তাই হয়, এই মতানৈক্য প্রকাশ্যভাবে ধংসের দিকে নিয়ে যায়।

পরিণতির দিক থেকে মতানৈক্যের প্রকারভেদ

খেয়াল খুশীমত বিরোধীতা ঃ এই বিরোধীতা নিজের আত্মচাহিদার আলোকে জন্ম নেয়,অথবা নিজের জন্য বা কোন ব্যক্তির আত্মসিদ্ধির জন্য হয়ে থাকে। আর এ ধরনের বিরোধীতার ঘটনার চাহিদা প্রকাশিত হয় চিন্তা, জ্ঞান ও স্থুল বিশ্লেষণের দিক দিয়ে। এই প্রকারের বিরোধীতা সকল দিকের বিবেচনায় নিন্দনীয়। কেননা এ ধরনের বিরোধীতা আত্মচাহিদার ওপর পর্যায় ক্রমে সত্যের বিপরীতে লোভ বিজয় লাভ করে। আর আত্মচাহিদা কখনও কোন কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে না। বরং এটি শয়তানের আনুগত্যের মাধ্যমে কুফুরীর দিকে নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا
كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ

www.pathagar.com

"আর যখনি তোমাদের কাছে কোন নবী রাসূল আসতেন, তোমাদের মনপূতঃ না হলে তোমরা অহংকার বশতঃ তাঁর অস্বীকার করেছো। তাদের একদলকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছ। আর তাদের এক দলকে তোমরা হত্যাও করেছো।" (বাকারা ঃ ৮৭)

আর খামখেয়ালী মনোভাব ন্যায়পরায়নতাকে ধ্বংস করে, যা জালিম লোকদের কর্মপদ্ধতি হিসেবে গণ্য হয়।

فلا تَتَّبِعُوا الهَوَى أنْ تَعْدِلُوا

"অতএব তুমি কখনো ন্যায় বিচার করতে নিজের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না।" (আন নিসা ঃ ১৩৫)

নিজের খেয়াল খুশী গোমরাহীতে পর্যবসিত হয় এবং পথভ্রষ্টতা বিভ্রান্ত হয়ে যায়।

قُلْ لا أتَّبِعُ أهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إذًا وَمَا أنَا مِنَ المُهْتَدِينَ

"আপনি বলে দিন আমি কখনো তোমাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করি না। (তা করলে) আমি গোমরাহ হয়ে যাবো। আমি আর সত্য পথের অনুসরণকারী থাকবে না"। (আনআম : ৫৬)

নিজের খেয়াল খুশীর অনুসরণ হচ্ছে জ্ঞান এর বিপরীত এবং জ্ঞানের সংকোচনের মাধ্যমে সত্যের বিপরীত, ধ্বংসের উপকরণ এবং পথভ্রষ্টতার পথ।

وَلا تَتَّبِعِ الهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إنَّ الذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ

"কখনও নিজের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না, তেমনটি করলে তোমাকে আল্লাহ তায়ালার রাস্তা থেকে বিচ্যুত করে দিবে।" (ছোয়াদ : ২৬)

وَلَوِ اتَّبَعَ الحَقُّ أهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ

"যদি এমন হতো যে, সত্য তাদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার অনুগত হয়ে যেত, তাহলে আসমান জমীন ও এতদুভয়ের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেত।" (মুমিনুন : ৭১)

www.pathagar.com

وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

"অধিকাংশ মানুষ সুষ্ঠ জ্ঞান ছাড়াই নিজেদের খেয়াল খুশীমত মানুষকে বিপথে চালিত করে।" (আনআম : ১১৯)

খেয়াল খুশীর (الهوى) অনেক প্রকার রয়েছে। আর এর উদ্দেশ্য ও বিধেয় বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যদি এ পরিণতি নফসের খেয়াল খুশী বা নিজস্ব মনের চাহিদা মত হয় তাহলে এ ধরনের هوى বা খেয়াল খুশী অনেকগুলো ক্ষতি এবং অনেক বিতর্কের উদ্ভব ঘটায়। এ অবস্থায় ঐ মানুষটি সত্য পথ থেকে বিচ্যুত না হয়ে গত্যন্তর থাকে না এবং তার নিকট সত্য বিমুখতা শোভনীয় হয়ে দাড়াঁয়। আর পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত হককে বাতিল এবং বাতিলকে হক হিসেবে পরিগণিত করে। আল্লাহ মাফ করুন। বিদআতের প্রবক্তা, মতানৈক্য রোগে আসক্তদের আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে খেয়াল-খুশীর এ ধরনের প্রভাব থেকে নিজেদের প্রতিরোধ করার তৌফিক দিন। আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের প্রতি নেয়ামত সমূহের মধ্যে এটিও একটি যে, তাদের খেয়াল খুশী গোমরাহীর স্তরে পৌছাবার আগে তাদের মাজহাব বন্দীতার চিন্তা ও আকীদায় তাদের নিয়ে যায়। এখানে আল্লাহ তায়ালা তাদের আলোর দিশা দান করেন, ফলে তারা তাদের ঈমানী মশাল দ্বারা এই মাজহাব বা চিন্তা শক্তি বা তাদের আকীদাগত ধ্যান ধারণা তাদের বিচ্যুত হতে দেয়না, কেননা মৌলিক ভাবে তাদের বিশ্বাসের মধ্যে এসবের কোন অস্তিত্ব খুজে পায়না। বরং যা থাকে তা তাদের মেধা, খেয়ালখুশী অথবা তা তাদের লালিত স্বপ্নের বহিপ্রকাশ ঘটে এবং তাদের নিজেদের আত্মভোলা করে তোলে, যদিও তা মৌলিকভাবে অন্যায়। এখানে তাদের জন্য অস্তিত্বগত কোন মৌলিকত্ব নেই যা তাদের জ্ঞান তাদেরকে প্রতিত করে।

খেয়ালখুশীর বহিঃপ্রকাশ তা চিন্তার মধ্যে অনেক মতে এবং পথে ক্রিয়াশীল হয়। এর মধ্যে কিছু অভ্যন্তরীণ আর কিছু বহিরাগত।

ইসলামে মতানৈক্যের পদ্ধতি

ক. চিন্তা শক্তির রায় ও মনের প্রভাব প্রকাশের পন্থা হচ্ছে মতবিরোধের কেন্দ্রস্থল। এটার মাধ্যমে কিতাব ও সুন্নাহ ভিত্তিক অহীর জ্ঞানের বিস্তৃতিকে বাধাগ্রস্ত করে। আর সত্য ও ন্যায়ের জন্য মনে যে স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে তার

www.pathagar.com

জন্য এটি অপেক্ষা করতে দেয় না এবং এর মাধ্যমে এমন পিপাসা জন্ম নেয় যা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত থেকে বিচ্যুতি ঘটায়।

এ ধরনের চিন্তা ও জন্ম নেয়া মনের ইচ্ছা দ্বারা যা প্রকাশিত হয় তা হচ্ছে মানুষ এটাকে চিন্তা ও গবেষণা আকারে গ্রহণ করে। অথচ এ চিন্তাভাবনা গাইরুল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহবান জানায়। পক্ষান্তরে মানুষের জীবনে শরীয়াহ বিরোধী বিষয়ের দিকে নির্দেশনা প্রদান করে। এ ধরনের চিন্তা ব্যাভিচারকে বৈধ ও অবৈধের মাঝখানে দাঁড় করায়। মিথ্যাকে চাকচিক্য দান করে। অথবা অপব্যয়ের প্রতি লোভাতুর করে তোলে। ফলে এ অবস্থায় মনের চাহিদার বিরূদ্ধে যাওয়া তখন আর সম্ভব হয় না। আর এ অবস্থায় শয়তানের হাতে জিম্মী হওয়া ছাড়া আর কোন পথ থাকে না।

খ. নিজস্ব চিন্তার দ্বারা যে বিতর্ক বা মতবিরোধ সৃষ্টি হয় তা কেবলমাত্র নিজের চিন্তা ভাবনার উৎস স্থল থেকে প্রকাশিত ও প্রতিভাত হয়। আর তা নিজের চিন্তারই সত্যতার উপাদানের প্রতি আকৃষ্ট করে, অন্য কোন দিকে নয়। আর তা চিন্তাশীলের নিজস্ব গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যদি তা পরিবর্তন যোগ্য হয় তাহলে তা সম্ভব? আর এখানে কি দুর্বলতা ছাড়া অন্য অবস্থা টিকতে পারে? ফলে চিন্তাশীল নিজের চিন্তার গভীরে প্রবেশ করে। নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে দুর্বলতা ও শক্তি মাঝখানে দোদুল্যমান অবস্থায় রাখে যা তাকে নির্দিষ্ট একটি দিকের প্রতি অনুগত করে দেয়। এটি হচ্ছে নিজের খেয়ালের সৃষ্টি। আর তা শয়তানের আবিষ্কার। আল্লাহর কাছে এজন্য পানাহ চাইবেন। আর শুকরিয়া আদায় করবেন এজন্য যে, নিজের খেয়াল খুশীর নিকট এধরনের বন্দী হওয়ার আগে আসল চিন্তার চোখ খুলে যাবে।

সত্য ন্যায় বিরোধী মতামতের বিরোধীতা

এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মতবিরোধ যদি নিজের খেয়াল খুশীমত হয় তাহলে তা একটি অদৃশ্য শক্তির চিহ্ন হিসেবে তৈরী হয়। এ ধরনের মতবিরোধ সত্য ন্যায়ের বিরুদ্ধে চলে যায়। যা দ্বারা জ্ঞান বিলোপ পায়, বিবেকের প্রচ্ছন্নতা বাধাগ্রস্ত হয়। ঈমানের অবশ্যম্ভাবীকতা লোপ পায়। তাই আহলে ঈমানদের বিরোধীতা হবে আহলে কুফর, শিরক ও নিফাকের বিরুদ্ধে। যা অত্যাবশ্যক, কোন মুমিন মুসলমান এ থেকে বিরত থাকতে পারেনা। অথবা একে বিতাড়িত করার সংগ্রাম থেকে নিজেকে সরায়ে রাখতে পারেনা। কেননা

www.pathagar.com

এ বিরোধীতা হচ্ছে ঈমানের অক্ষুন্নতা ও সত্যকে সংরক্ষণের নিমিত্তে। এভাবে মুসলমানদের বিরোধীতা কুফুরী আক্বীদায় বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে, নাস্তিকদের বিরুদ্ধে। এসকল মতবাদে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে মতবিরোধ দ্বারা আল্লাহর দ্বীনের দিকে আসার কারণ সমূহকে দূর করার সংগ্রামকে বাধা প্রদান করেনা। বরং তাদেরকে কুফর, শিরক, বিভক্তি, নিফাক, খারাপ চরিত্রাভ্যাস, নাস্তিক্যবাদ, বিদাআত ও আকীদাগত ধ্বংসের বিরোধীতা করার জন্য আহ্বান জানায়।

প্রশংসা ও নিন্দার মধ্যে অবস্থিত মতবিরোধ

এটি দু'পক্ষের কোন মতের প্রতিই সমর্থন নিরংঙ্কুস হতে পারেনা। এটা এমন এক মতবিরোধ যা শাখা প্রশাখা গত কার্যাবলীর দ্বারা হুকুম সমূহ নির্গত করা হয়। যা বিভিন্ন অবস্থায় পরস্পর পরস্পরের ওপর প্রাধান্য দেয়ার জন্য সাব্যস্ত করে। এর কারণ-প্রকৃতিগুলো সামনে আলোচনায় আসবে ইনশাল্লাহ।

উদাহরণ স্বরূপঃ আলিমগণের ইখতিলাফ অযু বিনষ্ট হওয়ার ব্যাপারে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার বিষয়ে আঘাতও স্বাভাবিক বমির মাধ্যমে। তাদের মতবিরোধ আছে ইমামের পেছনে কিরাত পড়া নিয়ে, সুরাহ ফাতিহার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া নিয়ে, জোরে 'আমিন' উচ্চারণের ব্যাপারে ইত্যাদি।

এ ধরনের মতবিরোধ দৃঢ়পণের এক প্রকারের বিচ্যুতি। এটি খেয়ালখুশী ও তাকওয়া মিশ্রিত থাকে,জ্ঞান ধারণার (অনুমান) সাথে, বিজয় ও বিজিতের সাথে,প্রত্যাখ্যাত গ্রহণ যোগ্যতার মাঝে অবস্থান করে। এর মাধ্যমে মতবিরোধের স্বপক্ষীয় হুকুমের প্রতি ধাবিত হওয়া ছাড়া কোন পথ থাকেনা। অন্যদিকে ঝগড়া, বিবাদ ও বিভক্তির সৃষ্টি হয়। মতবিরোধকারী দু'পক্ষ তাকওয়ার অবস্থান থেকে নিজেদের খেয়ালের গর্তে নিপতিত করে। শয়তান তার দল ভারী করার জন্য সহায়তা লাভ করে। মতবিরোধের ওপর ওলামায়ে কিরামের রায় আমরা যা জেনেছি তা হলো, ওলামায়ে কিরাম (জ্ঞানী ও চিন্তাবিদ) মতবিরোধকে প্রত্যাখান করেছেন। তা যে ধরনের মতবিরোধই হোকনা কেন। আর এর থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাগিদ দিয়েছেন।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, মতবিরোধ নিকৃষ্ট।[৩]

www.pathagar.com

সাবকী (রহঃ) বলেন, বিনা ইখতিলাফে রহমত পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ

"অধিকন্তু তারা মতবিরোধে জড়িয়ে পড়েছে, তাদের মধ্যে কতিপয় ঈমান আনয়ন করেছে,আর কতিপয় অস্বীকার (কুফুরী) করেছে।" (বাকারা:২৫৩)

হাদীসে এসেছে, রাসূল (সাঃ) বলেন,

إنما هلكت بنوا إسرائيل بكثرة سؤالهم واختلاف على أنبيائهم

"নিশ্চয়ই বনী ইসরাইলগণ ধ্বংস হয়েছে অধিক প্রশ্ন করার দোষে দুষ্ট হয়ে, আর তাদের নবী গণের বক্তব্য নিয়ে মতবিরোধ করে।[৪]

এ বিষয়ে অনেক কুরআনের আয়াত ও হাদীসে রাসূল বিদ্যমান রয়েছে। সাবকী (রহঃ) তৃতীয় মতবিরোধ (নিন্দা ও প্রশংসাজনিত মতবিরোধ) তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তিনি বলেন মতবিরোধ তিন প্রকার। এর মধ্যে একটি নীতির ওপর (الأصول) যা কুরআনের দলীল দ্বারা সাব্যস্ত নয়। আর এই ধরনের মতবিরোধ বিদআত ও পথভ্রষ্টতা আর তা কুফুরী। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে নানা মত ও পথ নির্দেশক। দাঙ্গা হাঙ্গামার নিয়ামক। তাও হারাম। কেননা তা সমঝোতাকে ধ্বংস করে দেয়। তৃতীয় প্রকার হচ্ছে শাখা-প্রশাখা জনিত আহকাম সমূহ নিয়ে মতবিরোধ। যেমননিভাবে হারাম ও হালালের নানা প্রকৃতির ব্যাপারে ইখতিলাফ। এর মাধ্যমে মতৈক্যও সাব্যস্ত হয়। এটা (তিন প্রকার) মতবিরোধগুলোর মধ্যে উত্তম।[৫]

এভাবে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক সাবধান করেছেন, ইবনে হাজম (রহঃ) এর বাণীর দিকে যেখানে তিনি মতবিরোধে কোন রহমত নেই বলে সাব্যস্ত করেছেন। বরং তিনি এটাকে পরিপূর্ণ আকারে অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে পরহেজ করার প্রবক্তা ছিলেন। মতবিরোধের ক্ষতি ও ভয়াবহতার জন্য এটা জানা যথেষ্ট যে, আল্লাহর নবী হারুন (আঃ) মতবিরোধ ও শ্রেণী বিভক্তিকে সবচাইতে বড় ক্ষতি হিসেবে গণ্য করেছেন। মূর্তি পূজার চাইতেও জঘন্য বিবেচনা করেছেন। যখন মূসা (আঃ) তুর পাহাড়ে ৪০ দিনের জন্য চলে যাবার পর সামেরী নামক যাদুকর তার জাতিকে স্বর্ণের গো বাছুর পূজা করতে বলল। এ অবস্থায় হারুন (আঃ) তাদেরকে বললেন, (ঠিক আছে) তোমরা এর পূজা

www.pathagar.com

কর, এটাই তোমাদের মাবুদ এবং মূসারও মাবুদ। (তাহা – ৮৮) হারুন (আঃ) প্রজ্ঞার সাথে তার জাতিকে উপদেশ দিলেন।[৬] তার ভাই মুসা (আঃ) আসা পর্যন্ত তার জাতি গো বাছুরের পূজা করেছে। মুসা (আঃ) তাঁর ভাইকে চপেটাঘাত করে কারণ জানতে চাইলে হারুন (আঃ) বললেন–

قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي

"হে আমার ভাই, তুমি আমার দাঁড়ি ও মাথায় পাকড়াও করোনা, আমি ভীত ছিলাম যে, তুমি বলবে আমার নির্দেশ পালন না করে তুমি বনী ইসরাইলকে দ্বিখন্ডিত করেছ। (তাহা – ৯৪)

এটা এজন্য ছিল যে, তিনি বহুধা বিভক্তি ও মতবিরোধকে ভয় করেছেন, অস্বীকারের চাইতে বেশী। জাতির ঐক্য অটুট থাকলে অস্বীকারে কিছু যায় আসে না।

---

১ ও ২. মিফতাহুস সাদাত ,২য় খন্ড, পৃঃ-৫৯৯, দারুল কুতুব মিশর এবং তাবিকাতুল জুরাজানী পৃঃ-৬৬ (হাম্বলী সংস্করণ)।

৩. ইবনে কুতাইবা পৃঃ ২২, আওয়াছেম মিনাল কাওয়াছেম পৃঃ ৭৮, আল মাহছুল পৃঃ ৪৮০।

৪. এবিষয়ে হযরত আবু হুরায়রা থেকে মাসনাদে আহমদ ,নিসায়ী, ইবনে মায়ায থেকে হাদীস বর্নিত হয়েছে। ফাতহুল কাবীর ২য় খন্ড -পৃঃ ১২০ আল আহকাম ৫ম খন্ড পৃঃ ৬৬।

৫. আল ইবহাজ ৩য় খন্ড পৃঃ ১৩।

৬. হারুন (আঃ) এর আগে তাদের বলেছিলেন, হে আমার জাতি ,এর মাধ্যমে তোমরা ফিতনায় লিপ্ত হবে। তোমাদের রব অতিশয় দয়ালু। তোমরা অনুগত হও ও আমার নির্দেশ পালন কর। (তাহা–৯০)

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

মতানৈক্যের ইতিহাস ও পরিসীমা

রাসূলের (সাঃ) যামানায় সাহাবাগণের মতানৈক্য

ইতোপূর্বে যে সকল মতানৈক্যের আলোচনা আমরা পেশ করেছি, সেগুলো রাসূল (সাঃ) এর জীবদ্দশায় প্রকৃত অর্থে মতানৈক্যে সাহাবায়ে কিরামের জড়িত হওয়ার সম্ভব ছিল না। কেননা রাসূল (সাঃ) ছিলেন সকল মতৈক্যের কেন্দ্রস্থল। তাদের সকল কাজের দিক নির্দেশক, তাদের সকল দিকের ভয় প্রদর্শক ও তাদের সকল প্রশ্নের সঠিক জবাবদাতা। ফলে যখনি সাহাবাগণ (রাঃ) কোন বিষয়ে মতানৈক্যে আবর্তিত হতেন, তখনি তারা তা রাসূলের দরবারে নিয়ে আসতেন। রাসূল (সাঃ) তখন তার সঠিক ব্যাপার তাদের সামনে স্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিতেন। আর সামনে হিদায়েতের রাস্তা (পরবর্তী করণীয়) বলে দিতেন। কোন কাজ যদি এমন হতো যে, তারা করতে সক্ষম হতোনা। সেগুলো রাসূলের নিকট নিয়ে আসতেন। যদিও মদীনা তাদের জন্য দূরবর্তী হতো। কখনও কখনও কুরআনুল কারীমের তাফসীর সম্পর্কে তাদের মতানৈক্য হতো, অথবা রাসূলের সুন্নাহ্ নিয়ে। তখন তারা এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার মাধ্যমে হাদীসের নির্দেশনার আলোকে সমাধান করতেন। যদি এ দু'য়ের মাধ্যমে সমাধান করতে না পারতেন তখনি তারা গবেষণার বিষয় বস্তুতে মতানৈক্য করতেন। তখন এসব সমস্যা নিয়ে মদীনায় ফিরে সমাধানের পথ খুঁজে পেতেন। রাসূলের (সাঃ) সামনে আসার পর তারা দলীল ও গবেষণা সম্পর্কে আলোকপাত করতেন। রাসূলের (সাঃ) সামনে পেশ করার বিষয়টিও তখন সুন্নাহ হিসেবে পরিগণিত হয়ে যায়। রাসূল (সাঃ) তখন তাদের সামনে প্রকৃত সত্য ও সঠিক পরিণতি খোলাসা করতেন এবং তাদের বিধান দ্বারা নিশ্চিত করতেন। তারা তা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিতেন এবং মতানৈক্য প্রত্যাহার করতেন। এ ধরনের কয়েকটি উদাহরণ :

www.pathagar.com

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ) আহযাবের যুদ্ধের দিবসে বলেন, আমরা আছর পড়ছি না বনী কুরায়যায় উপস্থিতি ব্যতিত। এরপর কেউ কেউ আসর পথে পড়ে নিলেন, আর কেউ কেউ বললেন, না বনী কুরায়যায় যাওয়া ব্যতিত পড়ব না। অন্যরা বললেন, বরং পড়ে নেয়াই ভালো, কারণ সময়তো বসে থাকবে না। রাসূল (সাঃ) কে এ সকল অভিমত বর্ণনা করা হলো কিন্তু তিনি কাউকে এ সকল ব্যাপারে কিছু বললেন না।[১]

আলোচ্য হাদীস থেকে যা প্রতিভাত হয় তা হলো, সাহাবাগণ এ দু'টি পক্ষ রূপে অবস্থান নেয় সালাতুল আসর আদায় করা নিয়ে। এক পক্ষ রাসূলের বাণীর শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করেছেন। যেমন বলে থাকেন মানতিক (যুক্তি বিদ্যা) প্রবক্তাগণ। অথবা হানাফী মাযহাবের উসুলীন (নীতিশাস্ত্র প্রবক্তাগণ) الأصوليون। হিসেবে বর্ণনা করেন। রাসূলের বাণীর সারমর্মকে নির্দিষ্ট ভাবে গ্রহণ করেন। রাসূলের বাণীর পরিণতি ও ফলাফল দু'পক্ষের জন্যই নীতি হিসেবেই পরিগণিত হয়।

এখন যেসব মুসলিম সাহাবী রাসূলের বাণীকে প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করেন তারা এর দ্বারা সহজতর দলীল হিসেবে গ্রহণ করার সুযোগ গ্রহণ করেন। তারা চিন্তা ও গবেষণার পরিসীমা অতিক্রম করেননি। অপর পক্ষ সাহাবীগণ (রাঃ) বুঝেছিলেন যে, রাসূল (সাঃ) তাদেরকে দ্রুত পৌঁছার আগে আগে আসর নামাজ পড়তে হবে। (অর্থাৎ এ সময়ের পৌঁছাতে হবে) বনী কুরায়যায় নামাজ আদায় জনিত রাসূলের নির্দেশকে 'না বাচক' বুঝায় না। তাদের পৌঁছানো নামাজ দেরী করাতে পারে না। অপরদিকে ইবনে কাইয়্যেম (রহঃ) ফকীহগণের ইখতিলাফে দু'পক্ষের জন্যই শিক্ষণীয় ও গ্রহণীয় রয়েছে বলে মতামত দেন এবং তিনি বলেন, দু'পক্ষের মধ্যে যাদের উপর যারা আমল করবে তা উত্তমতার সাওয়াব লাভ করবে বলে তিনি অভিমত দেন। যারা বলবেন, যারা পথে নামায আদায় করে সময়মত নামাজ আদায় করার নির্দেশ পালন করেছেন এবং রাসূলের শিক্ষার বাস্তবায়ন করেছেন তারা উত্তম কাজ করেছেন।

আর যারা বলবেন– যারা দেরী করেছেন বনী কুরায়যায় নামাজ আদায় করার জন্য তারাও উত্তম।[২] এর জবাবে আমি বলব, রাসূল (সাঃ) এর জবাবে কোন পক্ষকে কিছু বলেননি। ফকীহগণ একে রাসূলের সুন্নাহ হিসেবে গন্য করেছেন। তা না হলে এটি রাসূলের নির্দেশ অমান্য করার জন্য দলীল হিসেবে গন্য

www.pathagar.com

হতো। রাসূলের এ ব্যবস্থায় বিষয়টি সেখানে নিষ্পত্তি হলো এবং সেখানে এর পরিসমাপ্তি ঘটলো।

খ. আরও উদাহরণ দেয়া যায় যে, যা আবু দাউদ ও হাকেম তাঁদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, উমর ইবনুল আস (আঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস তিনি বলেন, যাতে সালাসিল যুদ্ধে[৩] একটি ঠান্ডার রাত্রে আমার স্বপ্ন দোষ হলো। গোসলের কারণে আমার বড় বিপদের সম্ভবনা ছিল। তখন আমি তায়াম্মুম করলাম, তারপর আমি সাহাবীগণকে নিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করি। এ ঘটনাকে সাহাবীগণ নবী করীম (সাঃ) এর নিকট পেশ করলেন। রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন, হে উমর! তুমি তোমার সাথীদের নিয়ে নামাজ আদায় করলে অথচ তুমি ছিলে জুনুবী (গোসল ফরজ হওয়ার জন্য উপযুক্ত) তারপর আমি যে কারণে গোসল করা থেকে বিরত থাকি, তা বর্ণনা করলাম। আর আমি আল্লাহর ইরশাদ শুনেছি তিনি বলেন,

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"তোমরা নিজেরা নিজেদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিওনা (হত্যা করো না) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল।"(নিসা ঃ-২৯) রাসূল (সাঃ) ঘটনাটি শুনলেন এতে হাসলেন কিন্তু কোন কিছুই বললেন না।"[৪]

তাবীল বা ব্যাখ্যা ও তার প্রকারভেদ

ইতোপূর্বে আমরা যা আলোচনা করলাম, তাতে বলেছি যে, রাসূলের (সাঃ) যুগে সাহাবাগণ যে মতানৈক্য করেছেন এবং তৎ পরবর্তী যে সকল মতানৈক্য অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে তারা প্রকাশ্য দলীল (ظاهر نص) গ্রহণ করেছেন। আরও আলোচনা করা হয়েছে যে, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাবলীর মাধ্যমে তারা মতানৈক্যের অবস্থান নানা অবস্থায় সাব্যস্ত করেছেন। তারা তার মাধ্যমে একাধিক অর্থ বের করার জন্য প্রয়াসী হয়েছেন। এ সবই ছিল একটি দীর্ঘ কার্যক্রম, কিন্তু তারা সেখানে ঝগড়া-বিবাদকে নূন্যতম অবস্থায় রেখেছেন তাদের বিতর্কের মধ্যদিয়ে। এটার এজন্য যে, এসকল সাহাবীগণ (রাঃ) বুঝেছিলেন যে, এসব ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ দ্বীন (ইসলাম) সহজতর একটি পন্থা। আর শরীয়াহ মূলতঃ দুটি পদ্ধতি এবং দু'ধরনের সিদ্ধান্তের জন্য বিস্তৃত।

www.pathagar.com

সুবিজ্ঞ গবেষক এবং প্রসিদ্ধ ফকীহগণ যারা গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন শরীয়াহ'র মৌলিক ধারা গুলোর বর্ণনার ওপর। তারা তাকে উদ্দেশ্যের সঙ্গতিপূর্ণ করেছেন। ফলে তাদের কেউ কেউ দলীল হিসেবে প্রকাশ্য শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করে গবেষণা করেছেন। আবার কেউ কেউ প্রকাশ্য অর্থেও নেপথ্যের মর্মার্থ গ্রহণ করেছেন যা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ (تأويل) নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ এর উপকারীতা তাই নির্গত হয়েছে। যা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। এগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও এ সম্পর্কিত বিষয়াবলীর সমার্থক বিষয়গুলোর আলোচনা দাবী রাখে। এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যা শাব্দিক প্রকাশ্য অর্থের নেপথ্যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে আমরা আলোচনা করা যায় বিস্তৃত আকারে যা নিম্নরূপ :

১. নিকটবর্তী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ (تأويل قريب)

এটা হচ্ছে এমন বিষয় যেখানে নূন্যতম চিন্তার মাধ্যমে শাব্দিক অর্থ বুঝা বা জানা সম্ভব। যেমনঃ এতিমের মালের বিবেচনা নিশ্চিত করা। অন্যদের তাদের প্রতি দানশীল করে তোলা, তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করার ভয়াবহতা অথবা তার ভক্ষণকে হারাম মনে করা। যার দলীল আল্লাহর বাণীতে পাওয়া যায়–

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

"যারা ইতিমের মাল অন্যায় ভাবে ভক্ষণ করল,তারা যেন তাদের উদরগহর আগুন ঢুকিয়ে নিল।" (নিসা ঃ ১০)

অন্যদিকে কোন পাত্রের প্রস্রাবকে পবিত্র করার বিবেচনায় যদি প্রস্রাবকে কোন স্থিরকৃত পানিতে ফেলে পাত্রকে পবিত্র করার ব্যবস্থা করা। একে রাসূল (সাঃ) তার বাণী দ্বারা নিষেধ করেছেন–

لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِيْ الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْسِلُ فِيْهِ

"স্থিরকৃত পানিতে তোমরা প্রস্রাব করবে না। তারপর তাতে গোসল করবে না"।[৫]

এখানে বিবেচনায় বিষয় হচ্ছে, পূর্ববর্তী প্রস্রাবজনিত দুটি কাজই (পাত্রে থাকা ও পানি মিশ্রিত করা) প্রকারান্তরে মিশ্রিত করা জড়িয়ে ফেলার শামিল এবং পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াশীল। সুতরাং এর মাধ্যমে পবিত্রতার সম্ভাবনা নেই।

www.pathagar.com

২. দূরবর্তী অর্থ জ্ঞাপনার্থক ব্যাখ্যা ঃ

এটি হচ্ছে এমন বিষয়াবলী যা জানা বা বুঝার জন্য এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য শাব্দিক অর্থের উপর নির্ভর করে মর্মার্থের উপর নির্ভরশীল হওয়া যায়। যেমন নির্ভর করেছেন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ),যা তিনি সর্বনিম্ন সংখ্যা নির্ধারণে মাসের ব্যাপারে বলেছেন। আল্লাহর বাণী –

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا

"গর্ভে ধারণ ও দুগ্ধপানের সময়কাল ত্রিশ মাস।" (আহকাফ : ১৫)
একই সাথে আল্লাহ্ তায়ালার বাণী–

وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

"মায়েদের পুরো দুটো বছরই (তার সন্তান) বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত যে চায় খাওয়ানো পুরো মাত্রায় আদায় করুক।" (বাকারা : ২৩৩)
যেমনিভাবে ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) ইজমা (الإجماع) কে দলীল (الحجة) হওয়ার জন্য কুরআনুল কারীমের আয়াতকে নছ হিসেবে গ্রহণ করেছেন :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"যে ব্যক্তি তার কাছে প্রকৃত সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং ঈমানদারদের পথ ছেড়ে অন্য নিয়মনীতি অনুসরণ করবে তাকে আমি সেদিকেই পরিচালিত করবো যেদিকে সে চলতে চেয়েছে। তাকে আমি জাহান্নামের আগুনে পুড়িয়ে দেবো, তা কতো নিকৃষ্ট আবাসস্থল।" (নিসা : ১১৫)
উসুলে ফিক্হবিদ নিকট দলীল হিসেবে আল্লাহ্ তায়ালার বাণী–

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ

"সুতরাং সুক্ষ্মদৃষ্টিতে তুলনামূলকভাবে বিবেচনা কর।" (হাশর ঃ২)
এটি কিয়াসের জন্য দলীল হিসেবে পেশ করা হয়, যা শরীয়া'হর জন্য মৌলিক নীতিমালা গণ্য করার নিমিত্ত। এটি একটি সহজকরণ প্রক্রিয়া, নীতি শাস্ত্রবিদগণ (অসুলীন)এ-র প্রতি এটাকে এজন্য আবশ্যক মনে করেন, কেননা মানুষ চিন্তার গভীরে প্রবেশ করে না। এটা দূরদৃষ্টির উজ্জ্বল সীমানা, যেমনি

www.pathagar.com

ভাবে এর মাধ্যমে উপলব্ধি ও অনুধাবন করা সহজতর হয়, সাধারণ মানু
জন্য সহজতর হয় না।

৩. দূরতম ব্যাখ্যা ঃ

যা শাব্দিক অর্থের কোন তাৎপর্য বহন করে না। এ ধরনের ব্যাখ্যাকারী তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রমাণ-দলীল ব্যবহার করেন না। যেমনিভাবে আ তায়ালার বাণীর তাফসীর–

لامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

"তিনি তোমাদের জন্য দিক নির্নয়কারী চিহ্ন সমূহ সৃষ্টি করেছেন, নক্ষ দ্বারাও মানুষ পথের দিশা পায়।" (আন নাহল – ১৬)

এ তাফসীরকারগণ علامات দ্বারা ইমামগণকে উদ্দেশ্য করেন, আর نجم দ্বারা তার রাসূল (সাঃ) কে উদ্দেশ্য করেন। আবার অন্যান্য তাফসীরকার আল্লাহর বাণীর তাফসীর করেন–

تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ

"যারা ঈমান আনবে না তাদের জন্য নিদর্শন ও সাবধানবাণী কোন কাজে অ না।" (ইউনুস ঃ ১০১)

তারা বলেন, আয়াতে কারীমায় الآيات দ্বারা ইমামগণকে বুঝানো হয়েছে। শব্দ নবীগণকে বুঝানো হয়েছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ (তাবীল) প্রক্রিয়া বা সংশ্লিষ্টতা

এতক্ষণ আমরা যা আলোচনা করলাম তাতে একথা এসেছে যে, তা বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মূলত এমন একটি সামর্থের দিকে ধাবিত করে যা উপ ও গভীর অনুসন্ধানের (গবেষণা) উপর নির্ভরশীল। যা গ্রহণ করার জন্য করে দেয়। নতুবা প্রকাশ্য অর্থের মাধ্যমে মেনে নিতে হয়। ব্যাখ্যার গবেষণার কার্যাবলী ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই। কিন্তু ঈমানগত বি (আকীদা) সমূহে গবেষণার কোন প্রযোজ্যতা নেই। কেননা সেখানে প্রক দলীল (ظاهر النص) অর্থগত ব্যাপারে কোন অসুবিধার সৃষ্টি করে সবধরনের ব্যবস্থায় সেগুলোকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করার সুযোগ বিদ্য থেকে যায়। এর উপরই সাহাবায়ে কেরামগণ অবস্থান করেছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মতানৈক্যের ক্ষেত্রে দলীল সমূহের বুঝা ও বিশ্লেষণের কোন বিকল্প নেই। সাথে সাথে ব্যাখ্যা করার যত পদ্ধতি রয়েছে সেগুলো জানা প্রয়োজন, যেসব পদ্ধতি এ ধরনের অভিধানগত আলোচনায় পাওয়া যায়।

অন্য আরেকটি পক্ষের তাফসীর : আল্লাহ তায়ালার বাণী–

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۝ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ

"তারা প্রশ্ন করে মহাদিনের খবর সম্পর্কে।" (নাবা – ১-২)

ইমাম আলী (রাঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–

وإِنَّهُ هُوَ النَّبَأُ الْعَظِيمُ

যা শরীয়াহ'র উদ্দেশ্যকে শক্তিশালী করে। আর এটা সাধারণ নীতিমালা গুলোর জন্য একটি সহায়ক বিষয়। এ কারণেই নির্দেশ বা হুকুম নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রকাশ্য দলীল কিংবা তার ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করা হয়েছে। যা গবেষণার পদ্ধতি সমূহের কোন একটি পদ্ধতিকে অনুসরণ করার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ফিকহী গবেষণার কার্য সমাধা করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতেই শরয়ী নির্দেশনাকে বিবেচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার বাণীতে যা ঘোষণা করা হয়েছে–

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ

"অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! এর থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।" (হাশর : ২)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাফসীর বিষয়ক বর্ণনা করা গেলে চারটি পদ্ধতির উল্লেখ করেন।

১. আরবদের কথা মালার ব্যবহৃত পদ্ধতি।

২. এমন পদ্ধতি যেখানে অজ্ঞতার কোন লক্ষন থাকেনা।

৩. এমন পদ্ধতি যা আলিমগণের শিক্ষা থেকে পাওয়া যায়।

৪. এমন পদ্ধতি যেখানে لا يعلمه إلا الله বাক্য ব্যবহার করা হয়।

এ সবের ভিত্তিতে ব্যাখ্যার জন্য অর্থগত পরিচিতি এর প্রকার গুলোর পরিচিতি প্রতিভাত হয়েছে। আর একথাও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এর সাথে এবং তাফসীরের সাথে একটি শক্ত সম্পর্ক রয়েছে। কেননা প্রজ্ঞাপূর্ণ আল্লাহ (لشارع الحكيم) বিভিন্ন স্থানে যে সকল আয়াতের ব্যবহার করেছেন তাতেও লক্ষ্য করা যায়। যেমন আল্লাহর বাণী–

www.pathagar.com

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ

"আর প্রকৃত ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহই জানেন, আর যারা বিদ্যাবুদ্ধিতে পারদর্শী তারা বলে আমরা এর উপরই ঈমান আনয়ন করলাম।" (আলে ইমরান:৭)

উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মুফাসসিরগণ একথায় উপনীত হয়েছেন যে, তাবীল দ্বারা তাফসীর ও বয়ানকে বুঝানো হয়। তাঁদের মধ্যে আল্লামা তিবরী (রহঃ) রয়েছেন, তিনি এই বিষয় ইবনে আব্বাস (রাঃ) সহ অন্যান্য অনুসারীগনের বর্ণনাকে উল্লেখ্ব করেছেন। এভাবে রাসূল (সাঃ) এর দুয়াযা ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل

"হে আল্লাহ! তুমি তাকে (ইবনে আব্বাসকে) দ্বীনের বুৎপত্তি দান কর। আর তাকে তাবীল শিক্ষা দান কর।"

এখানে তাফসীর শব্দকে তাবীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও বিভিন্ন উলামাগণ যেমন রাগেব আসফাহানী তাঁর মুফরাদাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সেখানে তাফসীরকে সাধারণভাবে তাবীল নামে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনিভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনিভাবে তাফসীর শব্দটি ঐ সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে শব্দগত ও ব্যাখ্যাগত আলোচনা এসেছে। আর তাবীল শব্দটি ঐ সকল স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে নিগুঢ় অর্থ ও সারাংশ আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। একই ভাবে তারা একথারও ইংগিত দিয়েছেন যে, তাবীল এমন একটি অর্থকে বিজয়ী করে যা কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হয়, আর তাফসীর ঐ অর্থকে এবং অন্যান্য বিষযাবলীকে আলোচনা করে। সম্ভবতঃ এসকল আলোচনার ভিত্তিতে এবং পরিভাষার আলোচনা এতদুয়ের মধ্যে যে শক্তিশালী সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে, তা কিতাব ও সুন্নাহ মতে নির্দিষ্ট আকারেই রয়েছে। ফলে আমাদের জন্য 'তাবীল' ও 'তাফসীর' এর জন্য এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ ও সংশ্লিষ্টগণ উপাত্ত রেখে গেছেন, যা দ্বারা আমরা উভয়কে সনাক্ত করণে সক্ষম হই।

এতে কোন সন্দেহের সুযোগ নেই যে, আল্লাহ এমন সব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যা সংবেদনশীল আকারেই জানার সুযোগ দেয়া হয়েছে। যেমন তাঁর নাম সমূহের হাকিকত জানা, গুনাবলীর বৈশিষ্ট্য জানা, অদৃশ্যতার বিস্তারিত আলোচনা, ইত্যাদি...। এছাড়া অপর বিষয়গুলো হচ্ছে যেগুলোতে কারও জন্য তাফসীর বা তাবীল বর্ণনার কোন সুনির্দিষ্ট সুযোগ নেই। বরং এমন

www.pathagar.com

বিষয়গুলোর সীমা নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে যা, কিতাব ও সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে। এবার তৃতীয় প্রকারের আলোচনা তা এমন বিষয় যাকে আল্লাহ তাঁর নবীকে শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তার কিতাবে এ ব্যাপারে আহবান জানিয়েছেন এবং তার নবীকে তা শিক্ষাদানের এবং বর্ণনা করার আদেশ দিয়েছেন। এ বিষয়টি দুটি প্রকারের মধ্যে নির্ভর করে–

এক. ঐ বিষয় যা বর্ণনার আলোকে কিছু না বলে অন্য কোন বিষয় নির্দিষ্ট করা বৈধ নয়। যেমন নাজিলের কারণগুলো, নাসিখ মানসুখ ইত্যাদি।

দুই. ঐ সকল বিষয়গুলো যা রায় ও দলীলের পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হয়। আর এখানে বিশেষজ্ঞগণ দুটি অবস্থানে রয়েছেন ঃ–

ক. একপক্ষ যারা তাবীলের বৈধতার ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন। যেমন আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে। পরবর্তী অনুসারীগণ তাবীলকে নিষেধ করার মাযহাব গ্রহণ করেন। এটা বিশুদ্ধ মতামত।

খ. অন্য যারা মতৈক্যে পৌছেছেন তাবীলের বৈধতার ব্যাপারে, তা শরীয়াহর বিধানাবলী সাব্যস্ত করা হয়েছে। বিস্তারিত দলীলের মাধ্যমে। তাকেই ফিকহ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে উলামায়ে কিরাম তাবীল ও তাফসীরের জন্য শর্ত ঘোষণা করেছেন–

প্রথমতঃ তাবীল হবে প্রকাশ্য অর্থ বোধক শব্দের মাধ্যমে যা আভিধানিক পদ্ধতির অনুসরণে হবে। আর আরবগণের শাব্দিক প্রয়োগ পদ্ধতিতে তা সমার্থক হবে।

দ্বিতীয়তঃ কুরআন কারীমের কোন মৌলিক সূত্র (نص) নসকে বিনষ্ট করবে না।

তৃতীয়তঃ আলিম ও ইমামগণের মধ্যে এর ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কোন বিরোধীতা থাকবে না।

চতুর্থতঃ গ্রহণের উত্তম সুযোগ থাকার আবশ্যকতা বিদ্যামান থাকবে। যা মৌলিক সূত্র বা নীতিমালায় বর্ণিত হয়েছে। যাতে নাজিলের কারণ বা প্রেক্ষাপটকে বিনষ্ট করার প্রতিরোধের জন্য তা করা হবে।

www.pathagar.com

বাতিল ও বর্জিত তা'বীলের প্রকারভেদ

এ ধরনের তা'বীলকে নিম্নোক্ত প্রকারে বিন্যস্ত করা যায় ঃ

১. এমন তা'বীল বা তাফসীর যা কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তি থেকে প্রকাশিত হয়। যার কোন ভাষা জ্ঞান নেই, নেই কোন ব্যাকরণ জ্ঞান। এই তা'বীলের আবশ্যকতার জন্য আরও বিষয়াদীর নিকট মুখাপেক্ষী হতে হয়।

২. এমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যা সন্দেহযুক্ত, যা বিশুদ্ধ রেফারেন্স (সনদ) দ্বারা স্বীকৃত নয়।

৩. এমন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যার দ্বারা কোন বাতিল মাজহাব বা মতবাদকে উৎসাহিত করে সমর্থন করে এবং প্রকাশ্য কিতাব ও সুন্নাহর বিরোধীতা করে।

৪. এমন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যা কর্তিত দলীল দ্বারা সমর্থিত, যা উদ্দেশ্যকে পূরন করার জন্য উপস্থাপন করা হয়, কিন্তু তাতে কোন পরিপূর্ন দলীল পেশ করা হয় না।

৫. ঐ ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যা নিজেদের খেয়াল খুশীমত প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়াসী হয়। যেমন বাতিল পন্থীদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং তাদের নানা উপমা উদাহরণ।

উপরের আলোচিত তা'বীল বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পরিপূর্ন ভাবে বর্জনীয়। এটা আমরা ইতোপূর্বে যে দূরবর্তী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে (তাবীল মুসতাবাদ) আলোচনা করেছি। সাহাবায়ে কিরামগণের মধ্যে গবেষণা (আহলুল ইজতিহাদ) আমাদের দৃষ্টি দেয়া দরকার গবেষণার গুরুত্ব ও নেতিবাচক দিক সম্পর্কে। আর সাথে সাথে দৃষ্টি দেয়া দরকার আছার বা সাহাবায়ে কিরামের নিকট থেকে এর কি ধরণের সংশ্লিষ্টতা ও ধারাবহিকতা পাওয়া যায়।

আমরা দেখতে পাই, সাহাবায়ে কিরামের সকলেই ইজতিহাদ বা গবেষণায় মনোনিবেশ করেননি। বরং তাঁরাই মনোনিবেশ করেছেন যারা এর জন্য সক্ষম ও যথেষ্ট বুৎপত্তি সম্পন্ন ছিলেন। যারা এ সম্পর্কিত বুৎপত্তি অর্জনকারী ও পারদর্শী ছিলেন না। তারা ইজতিহাদ করার ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার সম্ভবনা দেখা দিয়েছে। রাসূল (সাঃ) এধরনের অবস্থাকে নিষেধ করেছেন এবং এধরনের কাউকেই তিনি অনুমোদন করেননি।

আবু দাউদ ও দারে কুতনীতে বর্নিত হাদীস, যা হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমরা একবার সফরে বের হলাম। তখন আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি মাথায় আঘাত প্রাপ্ত ছিল। এমতাবস্থায় তার ওপর

www.pathagar.com

গোসল ফরজ হল স্বপ্নদোষের মাধ্যমে। সে তার সাথীদের (অন্যান্য সাহাবীগণকে) কাছ থেকে জানতে চাইলেন যে, তায়াম্মুমের মাধ্যমে গোসল থেকে বাঁচার রোখছত পাওয়া যাবে কিনা। তাঁরা বললেন, না তুমি তায়াম্মুম করতে পারনা কারণ পানি ব্যবহারে সক্ষম। সে গোসল করল এবং সে পরক্ষণে মারা গেল। এরপর আমরা রাসূলের (সাঃ) নিকট ফিরে আসলে এ ঘটনা তাঁর নিকট বর্ণনা করা হলো। তিনি বললেন,

قاتلوه فقتلهم الله

"যারা তাকে হত্যা করেছে আল্লাহ তাদের হত্যা করবে।"

তোমরা কি তাকে জানতে চেষ্টা করনি, যখন তোমরা জান না তখন প্রশ্ন মাফিক উত্তর না দেয়াই ছিল তার জন্য আরোগ্যতা। তার জন্য তায়াম্মুম করাই যথেষ্ট ছিল। সংক্ষিপ্ত ভাবে হউক বা বিস্তারিত ভাবে হউক তায়াম্মুম করতে পারতো। বর্ণনাকারী হাদীসের মতনে অতিরিক্ত অংশ নিয়ে সন্দেহ করেছেন যেখানে বলা হয়েছে, আঘাত প্রাপ্ত স্থান কাপড় দিয়ে বেধে রাখত এবং মাসেহ করে নিত আর পুরো শরীর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলত।[৭]

রাসূল (সাঃ) ঐ ফতওয়া দাতাদের এখানে কোন প্রকার ছাড় দেননি। যদিও তারা তাঁর সাহাবী ছিলেন। বরং তাদের ভৎসনা করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন না জেনে ফতওয়া দেয়ার ব্যাপারে। তাদেরকে তাদের ভাইয়ের হত্যাকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, প্রয়োজনীয়তা এভাবেই সাব্যস্ত হবে যখন তাদেও মত সিদ্ধান্তহীনতা ও জ্ঞানহীনত বিদ্যমান থাকবে। প্রশ্ন কখনও ফতওয়ার দিকে ধাবিত করবেনা যদি সে বিষয়ে প্রকৃত ভাবে জানা থাকে। রাসূল (সাঃ) তাদেরকে সেদিকেই ইংগিত করলেন, প্রশ্ন জানা বা বুঝার বিষয়ে যা কুরআনে পাকে বর্ণনা করা হয়েছে।

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

"অতএব তোমরা জেনে নাও যারা আহলে যিকর বা চিন্তাবিদগণের নিকট থেকে, যদি তোমরা পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী না হও।" (নাহল : ৪৩)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আবু হানিফা ও মুহাম্মদ, আবু দাউদ, নিসায়ী, তিবরানী (রহঃ) তাঁরা উসামা বিন যায়েদ (রহঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সাঃ) আমাদের একটি সারিয়্যাহয় প্রেরণ করলেন। জুহাইনা এলাকার হারাকাত নামক স্থানে এক ব্যক্তির সাথে আমাদের সাক্ষাত হলো সে তৎক্ষনাত পড়ল "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" আমরা তাকে অস্ত্রের আঘাতে মেরে ফেললাম।

www.pathagar.com

পরক্ষণে বিষয়টি আমার মনে দাগ কাটল এবং আমি রাসূলের (সাঃ) এর নিকট বর্ণনা করলাম। রাসূল (সাঃ) বললেন, সে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ল, আর তাকে হত্যা করেছো? আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল, সেতো অস্ত্রের ভয়ে এটা বলেছে। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, তার অন্তর কি তুমি ফেড়ে দেখেছো। কি জন্য সে এটা পড়েছে কি করে তুমি তা জানলে? কিয়ামতের ময়দানে এই লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'র কি হবে, সেদিন তখন আমি মনে মনে চিন্তা করছিলাম, যদি এই দিনের পর আমি যদি ইসলাম গ্রহণ করতাম। এটা আমার বার বার মনে হতো।(৮)

প্রথম হাদীসে রাসূল (সাঃ) দ্বিমত পোষণ করেছেন। যেখানে সাহাবীগণ সাধারণ হুকুম প্রদান করলেন। যা তায়াম্মুমের জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু অবস্থার আলোকে ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত হওয়ার উপযোগ্যতা রয়েছে তা তারা অনুধাবন করেননি। তারা দৃষ্টি আরোপ করেননি আল্লাহ বানী, যাতে বলা হয়েছে,

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

"যদি তোমাদের মধ্যে কেউ রোগাক্রান্ত হয় অথবা সফরে থাকে অথবা কেউ পায়খানা থেকে এসেছে বা স্ত্রী সহবাস করেছে, কিন্তু পানি পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে তোমরা তায়াম্মুম করে নেবে পবিত্র মাটি দ্বারা।" (মায়েদাহ: ৬)

সাহাবায়ে কিরাম আহলে নজর না হওয়ার পরও অন্যদের থেকে সিদ্ধান্ত জেনে নেয়নি। অর্থ্যাৎ তাদের উদ্দেশ্যে রাসূলের বলার দ্বারা প্রমানিত হয় তারা সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন না এবং তাদের দেয়া সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। আর হাদীসে উসামায় (রাঃ) বুঝা যায় তিনি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দিক থেকে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যা নিম্ন বর্ণিত আয়াত ঃ-

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا

"যখন তারা আমার আজাব দেখল, তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকার করতে পারলো না।" (গাফির – ৮৫)

আয়াতে কারীমার নিষেধাজ্ঞাকে তাঁরা দুনিয়া আখেরাতের উপকারীতার জন্য বিবেচনা করেছেন। অথচ তা দুটি অবস্থার জন্য স্বাধীনভাবে 'আম বা সাধারন'। শুধু মাত্র আখেরাতের জন্য নির্দিষ্ট নয়। যেমনিভাবে এ আয়াত দ্বারা

www.pathagar.com

তা স্পষ্ট হতে যায়। সম্ভবতঃ নবী করীম (সাঃ) এর শব্দ প্রয়োগ 'তাকে হত্যা করা হয়েছে' দ্বারা তাই সাব্যস্ত হয়।

এমনিভাবে রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কিরামের সকল ফতওয়াকে তিনি সমর্থন করেননি।[৯]

রাসূল (সাঃ) এর নিকট লোকেরা ফতওয়া চাইত, তিনি অবস্থানেই রায় দিতেন কিংবা তার নিকট সিদ্ধান্তের জন্য নিয়ে আসা হতো তিনি সিদ্ধান্ত দিতেন। এছাড়া তিনি ভালো কাজকে ভাল বলেই রায় দিতেন আর কোন কোন ভাল কাজকে তিনি প্রশংসা করতেন। আর যখন খারাপ কাজ দেখতেন তখন তিনি তা নিষেধাজ্ঞা দ্বারা বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা নিতেন। এসব ঘটনা থেকে সাহাবায়ে কেরাম শিক্ষা গ্রহণ করতেন। পরস্পর পরস্পরের জন্য দেয়া রায়কে তারা মেনে নিতেন এবং অন্যদের কাছে তা প্রকাশ করতেন।[১০]

আর সাহাবীগণ যখন কোন বিষয়ে মতানৈক্য করতেন তখন সেগুলো নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থকে প্রাধান্য দিতেননা। এর বিপরীতে ঝগড়া বা বিভক্তি তৈরীর পথকে প্রশস্ত হতে দিতেন না। তারা ঐক্যকে গুরুত্ব দিতেন। তারা ঝগড়াকে পরিহার করার সর্বোত্তম চেষ্টা করতেন। কেননা তারা আল্লাহর কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ছিলেন এবং রাসূল (সাঃ) এর দিকে প্রত্যাবর্তন কারী ছিলেন। তারা এমন কোন ইখতিলাফকে মেনে নিতনা যা তদের মধ্যে পদস্খলনের অবস্থাকে প্রকাশিত করে, বরং তারা চেষ্টা করতেন এ ব্যাপারে যেন তারা দৃঢ় পদে অবস্থান করতে পারেন। আর যা তাদের ভ্রাতৃত্বেও ছায়ার নিচে অবস্থান করতে পারেন।

মতানৈক্য সম্পর্কে রাসূলের (সাঃ) সতকর্তা

রাসূল (সাঃ) তাঁর সাহাবীগণকে ইখতিলাফ সতকর্তা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, উম্মাহর সংকট উত্তরণের বিষয়টি পরস্পরের স্নেহ আস্থা ঐক্যবদ্ধ বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। তাঁদের মধ্যে আন্তরিকতা একত্ববাদ বিশ্বাস ও ভালবাসার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। তিনি এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, উম্মাহ'র ধ্বংস তাদের আন্তরিক অনৈক্য ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব সংঘাত ও কলহ দ্বারা নেমে আসে। সে কারণে আল্লাহর রাসূল (তাঁর ওপর

www.pathagar.com

দারুদ ও সালাম) পূনঃপূনঃ সতর্ক করে মতানৈক্য সম্পূর্নরুপে পরিহার করার আদেশ দিয়ে বলেন, কোন অবস্থায়ই মতানৈক্যে লিপ্ত হয়োনা তাতে তোমাদের অন্তর দ্বিখন্ডিত হয়ে যাবে।[১১]

আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণ স্বয়ং বলেছেন মত পার্থক্য কোন ভাল সৃষ্টি করেনা। ইবনে মাসউদ (রাঃ) একদিন বললেন, মতনৈক্য হচ্ছে খুবই খারাপ। মহানবী (সাঃ) নিম্নবর্ণিত ঘটনা মতানৈক্যের বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করে–

"আব্দুল্লাহ উমর (রাঃ) বলেন, একদিন আমি রাসূলের নিকট গমন করলাম। রাসূল দু'জন ব্যক্তির বড় বড় আওয়াজে কথাবলতে দেখলেন, তারা দু'জন কুরআনুল কারীমের দু'টি আয়াত সম্পর্কে মতানৈক্য করছিলেন। রাসূল (সাঃ) বের হলেন, তাঁর চেহারায় রাগান্বিত হওয়ার চিহ্ন লক্ষ্য করা গেল। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তীরা আল্লাহর কিতাব নিয়ে মতানৈক্য করার ধ্বংস হয়ে গেছে।[১২]

নাজ্জার ইবনে সাবরাহ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, একদিন একব্যক্তিকে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনলাম যা আমি রাসূলকে যেভাবে তিলাওয়াত করতে শুনেছি তার ব্যতিক্রম। আমি তার হাতে ধরলাম এবংতাকে নিয়ে রাসূলের দরবারে আসলাম। রাসূল (সাঃ) তখন বললেন, তোমরা দু'জনই ভাল করেছ। শু'বা বলেন, আমার ধারণা তিনি আয়াত বলেছেন,তোমরা কখনও মতানৈক্য লিপ্ত হওয়ার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।[১৩]

এখানে রাসূল (সাঃ) তাদেরকে যারা উপস্থিত ছিল এবং পরবর্তীতে আসবে, কোন অবস্থায়ই মতানৈক্যে করা যাবে না এবং তাদের তিনি এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কিরামকে জানতেন যে, তাঁরা কুরআন তিলাওয়াতের বিষয়ে বিশেষভাবে মতানৈক্য করতেন। সেজন্য তাঁরা বিশুদ্ব হাদীস উচ্চারণ করেন।

"তোমরা তোমাদের মনের সন্তুষ্টি সহকারে কুরআন তিলাওয়াত কর, যখন কোন স্থানে তোমাদের মধ্যে ইখতিলাক পরিলক্ষিত হবে তখন থেমে যাও।"[১৪]

রাসূল (সাঃ) কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করার জন্য বলার মাধ্যমে সতর্ক করে দিলেন যে, যখন তোমরা কুরআন তিলাওয়াতের কোন পদ্ধতি সম্পর্কে বা

কোন আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইখতিলাকে পতিত হবে। আর যদি মনের সন্তুষ্টি ও সাচ্ছন্দ থাকে তাহলে তোমরা ভাল করে বুঝতে পারবে। নির্দিষ্ট বিষয় জানতে পারবে। সেজন্য তোমাদের জন্য কর্তব্য যে,তোমরা তিলাওয়াত কালে উপলব্ধি ও চিন্তাশীলতার সাথে কুরআনুল কারীমের আয়াত তিলাওয়াত করবে। আমরা দেখি, এমনি ধরনের অবস্থা রাসূলের সাহাবীগণের মধ্যে বিয়াজিত ছিল তখন তিনি সতর্ক করেছেন ইখতিলাদের আদব বা পদ্ধতি সম্পর্কে। আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রাঃ) বর্ণনা করেন এ সম্পর্কিত ঘটনায়–

"আল্লাহ রাসূলের দু'জন প্রিয় সাহাবী নিজেদের মধ্যে একটি বিষয়ে মতানৈক্য করেছিলেন। তারা দু'জনই রাসূলের উপস্থিতিতে বাক্য বিনিময় করছিলেন,যখন তাদের নিকট বনী তামীম থেকে প্রতিনিধি দল এসেছিলেন। তাদের একজন প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে আকরা ইবনে হাবিসকে মনোনীত করার কথা বললেন, অপর জন প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে 'আল কারা ইবনে মা'বাদ ইবনে জাহিরাহ' এর নাম প্রস্তাব করলেন। আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ) কে বললেন,আমি আপনার বিরোধীতা করতে চাইনা। এই বিষয়ে একজনের কথার চাইতে অন্য জনের কথা বাড়তে থাকল। এ অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার পবিত্র কালাম অবতীর্ন হলো। ওহে হে! তারা যারা বিশ্বাসী অবশ্যই রাসূলের আওয়াজের চাইতে তোমাদের আওয়াজ বড় করো না। (আল কুরআন : ৪৯ ঃ ২–৩)

ইবনে আল জুবাইর আরও বলেন,এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত উমর আর কখনও এমন কথা বলেননি যা রাসূলকে এমন অবস্থায় শুনতে হয়েছে। অর্থাৎ কঠিন সাবধানতা অবলম্বন করেছেন বা মৃদু বাক্য দ্বারা কথা বলেছেন।[১৫]

উপরের এই আলোচনার আলোকে আমরা রাসূলের (সাঃ) সময়কালের ইখতিলাফের কতিপয় পদ্ধতিকে তালিকাভুক্ত করতে পারি ঃ

১. সাহাবায়ে কিরাম সম্ভব পর সকল চেষ্টাই নিয়োজিত করতেন যাতে মতানৈক্য পর্যায়ের যেতে না হতো তারা এমন বিষয়ে মতানৈক্য যেতেননা, যেগুলোতে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভবনা দেখা হতো। বরং তারা রাসূলের নির্দেশনা অনুযায়ী সেগুলো সমাধান করার চেষ্টা করতেন। এ সব অবস্থায় তারা পরস্পরকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতেন, যাতে কোন অমিল বা দোষ বর্ণনার সুযোগ তৈরী হতো না।

www.pathagar.com

২. যদি মত পার্থক্য দেখা দিত, তাহলে তা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতেন। আল্লাহর নবীর সাহাবীগণ দ্রুত এ অবস্থায় আলকুরআন বা রাসূলের নিকট তা সমাধানের জন্য নিত করতেন এবং যে কোন মতানৈক্য পূর্ণ দ্রুত উত্তীর্ণ করার ব্যবস্থা নিতেন।[১৬]

৩. সাহাবীগণ তাদের সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য তৈরী থাকতেন, যাতে কুরআনুল কারীমের অনুসরণে আল্লাহর রাসূলের বিচার ফয়সালা গ্রহণ করার ব্যাপারে তাদের পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ পরিলক্ষিত হতো।

৪. রাসূল (সাঃ) সাহাবীগণের সামনে ভুল ও শুদ্ধ পরিষ্কার করে বলে দিতেন। যে গুলোতে তাঁরা মত পার্থক্য করতো। এ বিষয়ে পরস্পরের জন্য প্রদত্ত ফয়সালাকে সুন্দরভাবে স্বাগত জানাতো। এই ব্যবস্থা আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণকে তাঁর সাথে মতানৈক্যকারী সাহাবী ভাইকে সন্মান জানাতে সাহায্য করেছে এবং নিজের রায়কে বর্জন করার জন্য সাহায্য করেছে।

৫. বিতর্কপূর্ণ বিষয়ের অবতারণার জন্য আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও প্রত্যয়কে বাস্তবায়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রাখতেন। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। এজন্য সত্যের মাপকাঠি কারো দ্বারাই বিনষ্ট হতো না।

৬. বিতর্কিত বিষয়ে ইসলামী নিয়ম পদ্ধতি ও ইসলামী আচরন বিধির পূর্ণ অনুসরণ করতেন।

কোন বিষয়কে আলোচনায় সমাঝোতা ও বিনয়পূর্ন আচরণ প্রদর্শন করতেন। কোন অবস্থায়ই তারা অনভিপ্রেত বাক্য ব্যবহার করতেন না বা অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ দেখাতেন না।

৭. তারা অনুমান ভিত্তিক বিষয়ে বিতর্কে জড়াতেন না বরং মতপার্থক্য সৃষ্টির স্থলে সম্ভব সমাধানের পথে অগ্রসর হতেন। এজন্য নিজেদের মতকে অপরের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতেন না এবং নিজেদের মতামত শ্রেষ্ঠ বলেও দাবী করতেন না। অন্যথা অন্যের মতামত শ্রদ্ধা জানিয়েই নিজেদের মতামত প্রদান করতেন।

উপরে বর্ণিত বিষয়াবলী হচ্ছে উৎকৃষ্ট ঐ সকল মতানৈক্যের নীতিমালা যা আমাদেরকে যেকোন মতানৈক্যের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে দেয়। রাসূলের যামানায় যা প্রকাশিত হয়েছিল তা আমাদের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ার জন্য অবশ্যই প্রযোজ্য হয়।

www.pathagar.com

সাহাবীগণের সময়কালে ইখতিলাফের জন্য পরিপালিত নীতিমালা

কতিপয় লেখক যারা ইসলাম ও মুসলিম ইতিহাসকে বার বার এভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছে যে, লোকেরা যেন বিশ্বাসকরতে বাধ্য হয় যে, সাহাবীগণের মত অবস্থা আর ফিরে আসা সম্ভব নয়, কেননা তারা একমাত্র এ অতুলনীয় ছিলেন। কিন্তু এটি ইসলামের প্রতি একটি সুনিপুণ বিদ্বেষ যে, সাহাবীগণের অনুসরণে কোন সমাজ পূনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। যে সমাজ কুরআন ও সুন্নাহ'র আদলে তৈরী হবে এবং সাহাবীগণের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সাধিত হবে। অথচ ঐপথে পথচ্যুত ব্যক্তিরা সাহাবীগণের অনুসরণের পথরুদ্ধ করে উচ্চাভিলাষের মানসিকতায় ধারাবাহিকভাবে তাদের কর্মকান্ড দ্বারা তাদের কার্যসিদ্ধির প্রচেষ্টায় শরীয়াহ কে সংরক্ষণের ছদ্মারচনে নীতি গ্রহণ করে চলেছে। সাহাবীগণ ছিলেন এমন একটি জাতি বা উম্মাহ যারা কুরআন সুন্নাহর আকারে তৈরী ছিলেন। দুটি বস্তু আমাদের নিকট সচরাচর বিদ্যামান। এগুলোর দ্বারা আল্লাহর কাম্য মানুষ যে কোন সময় যে কোন স্থানে তৈরী করা সম্ভব, যেখানে তারা এমন একটি কর্মপদ্ধতিকে গ্রহণ করবে এবং নীতিমালা সন্নিবেশন করবে, আর তারা জনগণকে কুরআন সুন্নাহর সাথে এমনভাবে সম্পর্কিত করবে যা সাহাবীগণ কর্তৃক করা হয়েছিল। কিয়ামত পর্যন্ত এ সত্য পথ পরিক্রমা চালু থাকবে। এ ব্যাপারেও অভিযোগ তৈরী করা হয় যে, কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক সাহাবীগণের গুণাবলীতে রাসূলের (সাঃ) আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব। তারা এগুলো বলার পর এভাবে পরামর্শ দিতে চায় যে, কুরআন ও সুন্নাহর বাস্তবায়নের সে সমকালের বিষয়গুলো নিতান্তই সাহাবীগণের জন্য শর্তযুক্ত ও নির্দিষ্ট ছিল উপযুক্ত নয়। ফলে নতুন কর্মপদ্ধতি এখন একটি কামনা ও বাসনা যার মাধ্যমে এমন একটি পরিণতির দিকে যাওয়া হবে,যার লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামের মতবাদকে অস্বীকার (কুফুরী) করার শামিল।

আল্লাহর নবীর সাহাবীগণ প্রয়োজনীয়তার আলোকে অনেক বিষয়ে মতপার্থক্য ও মতানৈক্য করেছেন। রাসূল (সাঃ) এর সময়কালে তারা মতানৈক্য করার সুযোগ লাভ করেছেন তাহলে তার পরে [রাসূল (সাঃ) এর ওফাতের পর] কেন তাদের মধ্যে মতানৈক্য হবে না।

ফলে হয়েছেও তাই, তাদের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত কারণে মতপার্থক্য হয়েছে। কিন্তু তাদের মতানৈক্যেরে জন্য উপযুক্ত কারণ বিদ্যমান ছিল এবং তাদের মতানৈক্য

www.pathagar.com

পরিচালিত হয়েছে একটি নীতিমালার ভিত্তিতে যা এমন বিষয় সমূহের সাথে সন্নিহিত ছিল যা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।

নবী কারীম (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর মতানৈক্য

১. সাহাবীগণের মধ্যে প্রথম মতানৈক্য হয় নবী করীম (সাঃ)এর ইন্তেকালের পর। উমর (রাঃ) এর দাবী ছিল আল্লাহর রাসূল মৃত্যুবরণ করতে পারেননা। তাঁর বিশ্বাস ছিল এটা স্বার্থান্বেসী (মুনাফিক) মহলের নিছক গুজব, তিনি হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বললেন, যে বলবে নবী মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে (তরবারী উচুঁ করে) এটা দিয়ে শাস্তি দেয়া হবে বলে হুমকি দিলেন। আবু বকর (রাঃ) এর নিকট এ কথা নিয়েই তিনি কাছাকাছি হলেন আবু বকর এ অবস্থায় কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে শুনালেন–

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

"মুহাম্মদ (সাঃ) রাসূল বৈ আর কিছু নন,তাঁর আগে অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন, যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন, বা হত্যাকৃত হন, তাহলে কি তোমরা পশ্চাদপদ হবে, আর যদি কেউ পশ্চাদপদ হয়ে যায় তাতে আল্লাহর কোন ক্ষতি নেই। অচিরেই তিনি শোকর গুজার বান্দাদের প্রতিদান প্রদান করতেন।" (আল ইমরান – ১৪৪)

আরও আল্লাহ তায়ালা বাণী পড়ে শোনালেন–

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

"নিশ্চয়ই আপনি মৃত্যুবরণকারী আর তারাও মৃত্যুবরণকারী।" (যুমার:৩০)

আয়াত সমূহের তিলাওয়াত শোনার পর উমর (রাঃ) এর হাত থেকে তরবারী পড়ে গেল এবং তিনি যমীনে ঢলে পড়লেন, আর তখনি তার রাসূল (সাঃ) বিয়োগ ব্যাথা অনুভূত হতে লাগলো। তিনি তখনি উপলব্ধি করলেন অহী নাজিলের পরিসমাপ্তির। তিনি আরও বললেন, আবু বকর যে আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে শোনালেন, আমার কাছে মনে হচ্ছে এটি এখন প্রথমই আমি শুনছি আগে আর শুনিনি।[১৭]

www.pathagar.com

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর তাঁর খিলাফাত আমলে তাকে একদিন বললেন, হে ইবনে আব্বাস তুমি কি জান, রাসূলের ওফাতের দিন অনুষ্ঠিত বিপর্যয়ে আমাকে কোন বিষয় সন্দীহান করেছে? আমি বললাম না, আমি জানি না হে আমীরুল মোমেনীন, আপনি ভাল জানেন, তিনি বললেন, আল্লাহর কসম ,এটা ছাড়া অন্য কোন বিষয় নয়, আমি তখন পড়ছিলাম আল্লাহর বাণী–

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“এভাবেই আমি তোমাদের মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যেন তোমরা সকল মানুষের উমর সাক্ষী হতে পারো, আর নবী হবেন তোমাদের উপর সাক্ষী ।” (বাকারা – ১৪৩)

আল্লাহর শপথ আমি এ চিন্তায় ছিলাম যে, রাসূল (সাঃ) তো তাঁর উম্মতের নিকট বাকী থেকেই যাবেন তাদের শেষ দিন পর্যন্ত সাক্ষীদাতা হিসেবে । এ চিন্তায় সেদিন আমি যা করেছি তার মূল কারণ ।(১৮)

হযরত উমর সেখানে ইজতিহাদ করেছেন কুরআনুল কারীমের আয়াত নিয়ে । তিনি সাক্ষীর অর্থ বুঝেছেন দুনিয়ার জন্য । আর সে দিক থেকে বিবেচনা করলে তো রাসূলের জন্য তাঁর উম্মতের শেষ দিন পর্যন্ত দুনিয়াতে বহাল থাকতে হয় ।

২. রাসূলের (সাঃ) দাফন নিয়ে বিতর্ক ঃ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর দ্বিতীয় বিতর্ক সৃষ্টি হয় রাসূল (সাঃ)-এর দাফন করার স্থান নির্বাচন নিয়ে। জনৈক ব্যক্তি বললেন, আমরা তাকে মসজিদের মধ্যেই দাফন করতে পারি। অন্যজন বললেন, না, বরং আমরা তাঁকে তাঁর সাহাবীগণের সঙ্গেই সমাহিত করতে পারি । আবু বকর (রাঃ) তখন বললেন, আমি রাসূল (সাঃ)কে বলতে শুনেছি, নবীগণ যেখানে (যেস্থানে) ইন্তেকাল করবেন, তাকে সেখানেই সমাহিত করতে হবে। এরপর সকলের ঐক্যমতে রাসূলের বিছানাপত্র সরায়ে ফেলা হলো, যে গুলোর উপর রাসূল ইন্তেকাল করেন । আর সেখানেই তাঁর জন্য কবর খোঁড়া হলো (১৯)

এই দুটি মতানৈক্য জটিল আকারের ছিল, কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম দ্রুত কুরআন ও সুন্নাহর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে ঐক্যমতের ভিত্তিতে সমাধান করে ফেললেন ।

www.pathagar.com

৩. রাসূলের স্থলাভিষক্তির (খলীফা নির্বাচন) ব্যাপারে মতানৈক্য ঃ

রাসূলের ইন্তেকালের পর তাঁর স্থলাভিষিক্তির বিষয়ে ইখতেলাফ দেখা দেয়। খলীফা মুজাহির থেকে হবেন, না আনসারগণের মধ্য থেকে হবেন? খলীফা কি একজন হবেন. না একাধিক হবেন? এমনি মতানৈক্য দেখা দিল মনোনীত ব্যক্তির শক্তি সামর্থ নিয়ে। বলা হলো, রাসূলের মত প্রাজ্ঞ বিচারকের বুৎপত্তি সম্পন্ন ও মুসলমানদের ইমাম হওয়ার যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে।

ইবনে ইসহাক এ প্রসঙ্গে বলেন, রাসূল (সঃ) ইন্তেকালের পরক্ষণে আনসারগণের একটি অংশ বনী সাআদাহ এ একত্রিত হয় আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ) এর নেতৃত্বে এবং যুবাইর ইবনুল আওয়াম ও তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ ফাতিমা (রাঃ) বাড়ীতে, মুহাজির গণের বড় অংশ আবু বকর (রাঃ) পক্ষ অবলম্বন করলেন। সেখানে উসাইদ ইবনে হোদাইর সহ বণী আবদুল আসলাহ অংশগ্রহণ করল।

এ অবস্থায় একটি বড় বিপর্যয়ের আশংকা দেখা দিল, আর যদি তা হয়েই যায় তাতে বড় ধরনের ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়। রাসূলের তিরোধাণের সাথে সাথে তাঁর মত বিশাল ব্যক্তিত্বেও অনুপস্থিতি ও উচ্চ মর্যাদাপূর্ন নেতৃত্বেও অভাব পূরণ কোন সাধারণ বিষয় ছিলনা। তার সম মর্যাদার কোন ব্যক্তিত্ব সাহাবীগণের মধ্যেতো ছিল না যদিও সাহাবায়ে কিরাম অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। যেমন উমর (রাঃ) এর বিষয়টি আমরা বলতে পারি তিনি এত বিরাট গুণাবলী সম্পন্ন হওয়ার পরও রাসূলের ইন্তেকালের পর তিনি ঘোষণা দিলেন, রাসূল ইন্তেকাল করতে পারেন না। সাহাবীগণের সকলেই নিজের জীবনের চাইতে রাসূলের জীবনকে বেশী ভাল বাসতেন। তাঁর প্রতি সাহাবীগণের অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল। তারা রাসূলের সকল কার্যাবলীকে পূণ্য অর্জনের এবং সন্মান জানানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

রাসূলের ব্যবহৃত অযুর এক ফোঁটা পানি তারা মাটিতে পড়ার আগে নিজেদের হাতে ব্যবহার করার জন্য চেষ্টা করতেন। এ কারণে বলা হয় পৃথিবীতে এমন কোন উম্মত বা জাতি নেই যারা তাদের নবীকে এমনিভাবে ভালবেসে ছিলেন, যেমনি ভাবে ভালবেসেছিলেন মুহাম্মদ (সাঃ) কে তাঁর সাহাবীগণ। তাদের অবস্থা ছিল যে, রাসূলকে দেখে তাদের চোখ তৃপ্ত ছিল না। বরং তাদের অন্তর ও শরীর রাসূলের সান্নিধ্যে তৃপ্ত ছিল। অর্থাৎ রাসূল (সাঃ)-কে ঘিরে তারা তাদের জীবনের সকল আশা ভরসা ও চলার অবলম্বন ছিল। ফলে এ অবস্থায়

www.pathagar.com

রাসূলের ইন্তেকালের শোক তাদেরকে এ সকল বিষয় হারানোর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ অবস্থায় কি হতে পারে বা ঘটতে পারে এ বিবেচনা সাহাবীগণের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে লোপ পেয়ে যায়। এটা ছিল রাসূলের প্রতি তাদের অতুলনীয় ভালবাসার বহি:প্রকাশ।

আল্লাহর রাসূল ছিলেন একটি মহৎ হাতের অধিকারী, যাতে দুনিয়ার মর্যাদা ও পরকালীন সৌভাগ্যের পরশমণি সাহাবীগণের মধ্যে তুলে দিতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে তারা বিয়োগান্ত দুঃখ-বেদনা ও শোকের ছায়ার মধ্যেও একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন। তারা তিলাওয়াত করলো আল্লাহর বাণী–

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

"মুহাম্মদ (সাঃ) রাসূল ব্যতিত আর কিছু নন, তাঁর আগে অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। যদি তিনি মারা যান বা হত্যাকৃত হন তাহলে তাতে আল্লাহর কোন ক্ষতি নেই, আর আল্লাহ অচিরেই শোকর গুজার বান্দাদের প্রতিফল পৌঁছে দেন।" (আল কুরআন ঃ ৩ঃ ১৪৪)

এই আয়াত তিলাওয়াতের পর তারা সকলেই সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে আসলেন, আর এমনি ভাবে রিসালাতের স্থায়ী সংরক্ষন করলেন। আর তখন সম্ভাব্য ফিতনাহ দূরীভূত হওয়ার উপায় নিশ্চিত হলো।

বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে রাসূলের জীবনের অনেক ঘটনাবলীতে নির্দেশনা ছিল যে, তাঁর পর আবু বকর (রাঃ) খলীফা হবেন এবং তাঁর পর উমর (রাঃ) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন। এমন কোন মুসলমান তখন ছিলনা যে, এদুজনের বিপরীতে মাথা তুলে কথা বলতে পারত। আবু বকর (রাঃ) ছিলেন, রাসূলের পর দ্বিতীয় ব্যক্তি, তাঁর একান্ত আন্তরিক বন্ধু, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত কালে হিজরতের সহযাত্রী, আর তিনি ছিলেন তাঁর অন্যতম ও প্রিয়তম স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) এর পিতা। আর তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি কোন সময়ই রাসূলের কোন কার্যক্রম থেকে বিচ্যুত ছিলেন না।

অপর দিকে উমর (রাঃ) কে ছিলেন? তিনি এমন ব্যক্তি ছিলেন যিনি মুসলমানদের মর্যাদার নিদর্শন স্বরূপ। তাঁর ইসলাম গ্রহনের মাধ্যমে অমুসলিম

www.pathagar.com

কুরাইশদের জন্য বিশাল ভীতির কারণ এবং তাঁর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত কুরআনুল কারীমের অহী হিসেবে নাযিল হয়ে স্বীকৃত হয়েছে। আর হাদীসে বহুবার এভাবে এসেছে রাসূল (সাঃ) একদিন আসলেন, তাঁর সঙ্গে আবু বকর ও উমর ছিলেন বা রাসূল (সাঃ) যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন আবু বকর ও উমর তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এই সব ঘটনাবলী তাঁদের নিয়ে বিতর্ক করা থেকে দূরে থাকার জন্য শক্তি ও প্রত্যয়কে ফাঁস করে দেয় এই উপলব্ধি সাহাবাগণের মধ্যে ছিল। রাসূলের তিরোধানের এই অভিজ্ঞতার মধ্যেই তাদের ফজিলত ও পরিনতি বিদ্যমান ছিল। কারণ তাদের মধ্যে এমন অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হয়েছিল, যা তাদের সকল কাজের মধ্যে ইতিবাচক ভাবে প্রতিফলিত হতো। তাঁদের মধ্যে মতৈক্য হতো আবার মতানৈক্যও হতো। তাদের জীবন প্রণালীর বিভিন্ন দিক ও শিষ্টাচার সকল বিপর্যয়কে তাদের কর্মপ্রণালী ও শিষ্টাচার সকল বিপর্যয়কে মোকাবেলা করার, রিসালাতের সংরক্ষন করার, উম্মাহ'র ঐক্যবদ্ধতা এবং রাসূলের সময়কালের দৃষ্টান্ত ও উপমাকে সামনে রেখে সকল কাজকে সহজে সমাধান করতেন।

বর্ণিত হয়েছে, একব্যক্তি এসে আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) কে বললেন, বনী সাদ গোত্রের একটি গ্রুপ সাদ ইবনে আবু উবার (রাঃ) পক্ষে মিটিং করছে। আপনাদের এ বিষয়ে এখনি ব্যবস্থা নিয়ে নিয়ন্ত্রেনের বাইরে যাবার আগেই উম্মাহর দায়িত্ব পালন করা উচিত। ইতোমধ্যে আবু বকর ও উমর এর নিকট পোছাল যে, রাসূলের লাশ দাফনের জন্য তৈরী। উমর বললেন, আমি আবু বকর (রাঃ) কে বললাম, চলুন আমরা আমাদের আনসার ভাইদের নিকট গমন করি, দেখি তারা কি বলে শুনা যাক। আমরা সে অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেব। আনসারগণ আমাদের থেকে পৃথক হয়ে ভিন্ন সভা করছে বণী সাদ গোত্রে। সেজন্য আমরা তাদের সাথে মিলিত হই। এ অবস্থায় গমনকালে পথিমধ্যে আনসারদের মধ্য থেকে দু'জন সৎলোক (আনসার) আমাদেরকে তাদের (আনসারগণের) সকল আলোচনা ও মনোভাব সবিস্তারে জানাল। তারা আরও বললো, কেন আপনারা সেখানে যাচ্ছেন, হে মুহাজিরুন! আমরা বললাম, আমরা যাচ্ছি এজন্য যে, তারা আমাদের ভাই, আমাদের আনসার ভাই। তারা বললেন, আপনারা তাদেরকে কোন প্রস্তাব দেবেন না। হে মুহাজিরগণ! নিজেদের মধ্যেই বিষয়টি ফয়সালা করুন। আমি বললাম, [উমর (রাঃ)] আল্লাহর শপথ আমরা অবশ্যই তাদের কাছে যাব। আমরা তাদের

www.pathagar.com

সভাস্থলে পৌঁছে তাদের সাথে মিলিত হবো, তারা দু'জন আমাদের সাথী হলো এবং অকুস্থলে একজন ঘুমন্ত লোক পেলাম। আমি বললাম ইনি কে? তারা জবাব দিলেন, সাদ ইবনে উবাদাহ। তার সাথে কোন অসুবিধা হলো কিনা? বললেন না তিনি অসুস্থ। আমরা এ অবস্থায় তাদের একজন বক্তার বক্তব্য শুনলাম, সে আনসারগণের সফলতা ও শ্রেষ্টত্বের কথা বললেন। আর আমাদেরকে সুপারিশ করলেন যে, তারাই রাসূলের খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য অন্য যে কারো চাইতে বেশী হকদার।

তাদের কথায় চুপ করে থাকা ছাড়া কোন উপায় ছিলনা। কেননা তারা ছিল স্থানীয় বাসিন্দা। এদিক থেকে তারা শক্তিশালী ছিল যা আজকের দিনে বলা হয়। আর তারা সেই আনসার যারা সর্বোত্তম সাহায্যকারী ছিলেন। তারা ঈমানের স্থান তৈরী করেছিলেন। ইসলামকে তারা তাদের স্থানে বিজয়ী করার আগে মনে বিজয়ী করে নিয়েছিলেন। একজন মুহাজিরও ছিলেন না যিনি কোন আনসার ভাইয়ের দ্বারা সহযোগিতা পাননি। তার প্রতি কোন অবদান কোন আনসারের ছিল না। যদিও খিলাফতের বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহতে সুস্পষ্ট দলীল বিদ্যমান ছিল, তবুও যেকোন প্রকারের দ্বন্ধ ও মতানৈক্য তারা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা মিটানোর চেষ্টা করতেন। কিন্তু এখানে সে ধরনের অবস্থা বিদ্যমান ছিলনা যে হিকমাহ্ দিয়ে বা অভিজ্ঞতা অনুসরণ করে এ সমস্যার সমাধান করে দেয়া যেতে পারত। কারণ দু'পক্ষের মর্যাদা ও অবস্থান কোন দিক দিয়েই খাট করে দেখার সুযোগ ছিল না। উমর (রাঃ) ভাল করে তাদের কথা শুনলেন আর চিন্তা করলেন। আর বলা শুরু করলেন। আর অমনি আবু বকর (রাঃ) বললেন, সন্মানিত ভাই আমি তাঁকে অসন্তুষ্ট করতে চাইনা। সে আমার চাইতে জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় বড়। আল্লাহর শপথ আবু বকরের সেদিনের বক্তব্য এত তাৎপর্যপূর্ণ ও জ্ঞান গর্ভ ছিল যে, তাঁর বক্তব্যে আমরা আশ্বাম্বিত হলাম। তিনি বললেন, আনসারগণ, আপনারা নিশ্চয়ই ভাল। আপনাদের বক্তব্যে যা বলেছেন সবই ভাল। কিন্তু মুহাজির ভাইদের মর্যাদার ব্যাপারে তো বলেননি। তিনি বললেন আপনারা বিষয়টি শুধু মদীনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে চিন্তা করে বক্তব্য রেখেছেন। পুরো জাযিরাতুল আরবেই ইসলামের ছায়াতলে চলে এসেছে। সেজন্য মদীনায় আনসারগণের জন্য যদি মুহাজিরগণ খিলাফতের বিষয় ছেড়ে দেন, তাহলে পুরো আরবে কুরাইশদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে এই অনৈক্যের ইসলাম জাযিরাতুল আরবের বাইরে

www.pathagar.com

যেতে বাধাগ্রস্ত হবে। সেজন্য তিনি প্রস্তাব দিলেন যে, ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগের স্বার্থে রাসূলের বাণী সমূহের নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদেরকে আন্তরিক ভাবে বিষয়টির সুরাহা করতে হবে। তারপর তিনি অনুরোধ করে বললেন, আপনারা কুরাইশ থেকে দু'জন লোক বাছাই করুন, যাদের ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। একজন হলেন উমর বিন খাত্তাব অন্যজন হলেন উবাদাহ্ ইবনুল যাররাহ। সাথে সাথে তিনি তাঁর নিজের নামের মনোনয়নকে প্রত্যাহার করে নিলেন।

উমর (রাঃ) বললেন, আমি আবু বকর (রাঃ) এর বক্তব্যকে অস্বীকার করি না। যা তিনি ইতিপূর্বে বললেন। আল্লাহর শপথ! আমি এমন একটি অন্যায়ের কাছাকাছি যেতে পারি না, আর তা হচ্ছে যেখানে আবু বকর থাকা অবস্থায় অন্য কোন শাসক সেখানে মনোনীত হবেন।

এরপর আনসারগণের মধ্য থেকে একজন দাঁড়ালেন, আর বললেন, আমাদের পূর্ববর্তী জের ধরে বললেন, ঠিক আছে, আমাদের (আনসার) মধ্য থেকে একজন আর কুরাইশদের মধ্য থেকে একজন খলীফা মনোনীত হউক। উমর (রাঃ) পরিস্থিতি অবলোকন করে দেখলেন আস্তে আস্তে বাক-বিতন্ডা বেড়ে যাচ্ছে। আর এত জোরে কথাবার্তা হতে লাগল যে, তা মহাবিতর্কে রূপ নেয়ার উপক্রম হলো। ফলে উমর (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)কে বললেন, হে আবু বকর! তিনি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে আমি তার হাতে বাইয়াত হয়ে গেলাম। মুহাজিরগণ দ্রুত আমার অনুসরণ করে বাইয়াত নিতে থাকলেন। আর আনসারগণের মনোনীত প্রার্থী সাদ ইবনে উবাদাহ্ মারাত্মকভাবে পদদলিত হয়ে দুর্ঘটনায় পতিত হলেন অথচ তারা আবু বকর (রাঃ) হাতে বাইয়াত হওয়ার প্রতিযোগিতায় তার প্রতিও দৃষ্টি দেয়ার অবস্থা তাদের মধ্যে ছিল না। এভাবেই আল্লাহর নবীর সাহাবীগণ সক্ষম হয়েছিলেন বিনা বিচ্যুতি, বিনা সংঘাত ও সামান্য মনের দ্বন্দ্ব ব্যাতিরিকে খলীফা নির্বাচনের সমস্যা সমাধান করতে, যার মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াতের প্রাথমিক সোপান এভাবে সামনে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল।

www.pathagar.com

যাকাত আদায়ে মতানৈক্য

মতানৈক্যের চতুর্থ জটিল বিষয় ছিল যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার ব্যাপারে। যারা রাসূলের ইন্তেকালের পর নির্ধারিত হারে যাকাত আদায়ের বিষয়ে অস্বীকার করেছিল তাদের বিষয়েই এ মতানৈক্য দেখা দেয়। এ বিষয়েও সাহাবীগণ সক্ষম হলেন নিজেদের একনিষ্ট আন্তরিকতা এবং মতানৈক্যের শিষ্টাচার প্রয়োগ করার মাধ্যমে সমস্যা মোকাবেলার জন্য।

আবু বকর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে বাইয়াত অনুষ্ঠানের পর যারা নতুন ইসলামে দীক্ষিত হলো, কিছু কিছু রাসূলের পর নবুয়তের দাবীদার হলো, যেমন– মুসাইলামাতুল কাযযাব। কিছু কিছু লোক নামায ও যাকাত আদায়ে অস্বীকার করল। কিছু কিছু শুধুমাত্র যাকাত অস্বীকার করলো। কেউ কেউ আবু বকর (রাঃ) কে যাকাত আদায় করতে অস্বীকার করল নিছক অহংকার ও আত্মঅহমিকা বশতঃ। আরেক গ্রুপ ভ্রান্ত একটি ব্যাখ্যা দ্বারা দাবী পেশ করল যে, শরীয়াহ'র মূল নির্দেশনা অনুযায়ী যাকাত কেবল মুহাম্মদ (সাঃ) এর জন্য প্রযোজ্য অন্য কাউকে আদায়ে বাধ্যবাধকতা নেই। তারা কুরআনুল কারীমের নিম্মোক্ত আয়াতে পেশ করা ব্যাখ্যা দ্বারা বলল যে, এখানে কেবল নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য এটা প্রযোজ্য হতে পারে অন্য কারো জন্য নয় এবং আয়াত অনুযায়ী কেবল ঐ ব্যক্তিরই যাকাত সংগ্রহ করার ক্ষমতা রয়েছে। অন্য কারো এ ব্যাপারে এখতিয়ার নেই। আর তারা বলল, আয়াতে এও বলা হয়েছে যে, সেই পারে যাকাত প্রদানকারীর পবিত্র করার জন্য দোয়া করতে। সুতারাং অন্য কারো হাতে তো যাকাত আদায় করলে এটা করার সুযোগ নেই। আয়াত কারীমা হচ্ছে–

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"তাদের নিকট থেকে মালের যাকাত (সাদাকাহ) আদায় করে নিন, এর মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র ও বিশুদ্ধ করুন। আর তাদের জন্য দোয়া করুন, নিশ্চয়ই আপনার দোয়া তাদের জন্য প্রশান্তি হিসেবে গন্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।" (সুরাহ তাওবাহ – ১০৩)

www.pathagar.com

এই জটিল মতানৈক্য যারা যাকাত আদায়কে একেবারেই অস্বীকার করলো অথবা এককথায় বিভ্রান্ত হলো যে আয়াতে রাসূলের প্রতি সম্বোধন মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি কেবল মাত্র নবী হিসেবেই ছিলনা বরং তা ছিল মুসলমানদের প্রশাসক ও নেতা হিসেবে। যাকাত বিষয় মুসলিম সমাজের একটি প্রশাসনিক কাজ এবং সাংগঠনিক স্বাতন্ত্রিক বিষয় যেমনি সে সমাজের অন্যান্য আইনানুগ বিষয়াবলী ও দন্ডবিধির বেলায় তা প্রযোজ্য। এ সমস্ত কাজের দায়দায়িত্ব তাদের ওপর বর্তায় যারা ইসলামের ছায়াতলে এসে রাসূল (সাঃ)পর মুসলিম উম্মাহ'র মহান দায়িত্বে সমাসীন হন।[২০]

তাছাড়া সকল মুসলিম সমাজ রাসূলের হাতে বাইয়াত হয়েছিলেন, তখন তারা নামাজ ও যাকাত পালনের স্বীকারোক্তি সহকারেই বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। যা নিয়মিত পালনের দাবী রাখে এবং বাদ দেয়ার অথবা একটি থেকে অন্যটিকে পৃথক করে দেখার সুযোগ এখানে থাকেনা। আল্লাহর নবীর প্রথম খলীফা আবু বকর (রাঃ) এ দুয়ের সংরক্ষণ করতে এবং ইসলামের অগ্রগতির লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা হবে যারা আদায় করবে না অথবা ইসলামের তহবিলে (ইসলামী রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট তহবিলে) জমা দিতে অস্বীকার করবে। আর তারা যা রাসূলের হাতে বাইয়াত গ্রহনের মাধ্যমে যা সাব্যস্ত করেছিল এটা ছিল তার পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম খলীফা যেখানে যে অনড় অবস্থানে ছিলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করলেন। উমর (রাঃ) যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে অনুমতি দেয়ার ব্যাপারে সন্মত ছিলেন না। ফলে দু'জনের জন্য এ বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিল।

আবু হুরায়রা (রাঃ) এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন, যাতে এটা বুঝা যায় যে, কিভাবে মতানৈক্য হয়েছিল এবং তার সমাধান তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। "যখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) পারাপারে শান্তিতে ইহকাল ত্যাগ করলেন, আবু বকর খলীফা নির্বাচত হলেন, আরবের কিছু কিছু লোক কুফুরীতে প্রত্যাবর্তন (মুরতাদ) করল। উমর (রাঃ) বললেন, আপনি কিভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবেন যেখানে আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করেছেন–

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَمَنْ قَالَهَا
فَقَدْ عَصَمَ مِنِّيْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى

www.pathagar.com

"অর্থাৎ আমি আদিষ্ট হয়েছি যুদ্ধ করার জন্য ঐ ব্যক্তি পর্যন্ত যে বলবে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, যে এটা মুখে বলল, সে জান ও মালসহ নিরাপদ হলো, তার হিসাব নিকাশ কেবল মাত্র আল্লাহর যিম্মাদারীতে চলে গেল ।"
আবু বকর (রাঃ) বললেন, আমি শীঘ্রই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে। কেননা যাকাত হচ্ছে সম্পদের অধিকার। আল্লাহর শপথ যদি একটি ছোট্ট ছাগলের বাচ্চা যাকাত দেয়ার ব্যাপারে অস্বীকার করে যা রাসূলের জীবদ্দশায় যাকাত দেয়া বাধ্যতামূলক ছিল। উমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ, এটা ছাড়া অন্য কোন কারণ ছিলনা যে, আল্লাহ আবু বকরের (রাঃ) বক্ষ খুলে দিয়েছিলেন এই ধরনের যুদ্ধের জন্য, অতপর আমি বুঝতে পারলাম যে, আসলেই তিনি সঠিক সিদ্ধান্তের উপর ছিলেন ।(২১)
ইবনে যায়েদ এ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন, আল্লাহ সালাত ও যাকাত সন্মিলিত ভাবে ফরজ করেছেন। তাতে কোন বিভক্তি নেই। আর তিনি কুরআনের আয়াত তিলওয়াত করলেন –

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

"যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই ।" (সুরা তাওবাহ ঃ ১১)
যে কারণে আবু বকর (রঃ) প্রত্যাখ্যান করলেন যাকাত আদায় বিহীন সালাতের দাবীকে। আল্লাহ তায়ালা তার উপর রহম করুন, কেননা তিনি এ ব্যাপারে দৃঢ়চেতা ছিলেন, তাদের সাথে কোনই আপোষ নেই যারা সালাত ও যাকাতকে পার্থক্য করার জন্য চেষ্টা করবে ।
আবু বকর ও উমর (রাঃ) এর মধ্যে মতপার্থক্যের কেন্দ্রে ছিল হাদীসের শাব্দিক অর্থ নিয়ে। উমর (রাঃ) হাদীসের অর্থের প্রতি খেয়াল করে ধারণা করেছিলেন যে, এ দুটি শাহাদাতের (আল্লাহ ও রাসূলের) মাধ্যমে ইসলামের অন্তর্ভুক্তির জন্য যথেষ্ট করে দেয় এবং তার জান মাল নিরাপদ হয়ে যায়। অপর দিকে আবু বকর (রাঃ) তিনি এর অর্থের সাথে إلا بحقه শব্দের শর্তারোপ করার পক্ষপাতী ছিলেন অর্থাৎ তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যাকাত হচ্ছে মালের হক বা অধিকার বা দায়িত্ব। যা অবশ্যই আদায় যোগ্য। যার মাধ্যমে ঐ ব্যক্তি জান মালের দিক থেকে এখনি কেবল নিরাপদ হতে পারে। তাছাড়া তিনি এও

www.pathagar.com

বুঝেছিলেন যে, কুরআনের বহুস্থানে সালাত ও যাকাত একসঙ্গে আলোচিত হয়েছে, সেজন্য আল্লাহর রাসূল এই দুই স্তম্ভকে পৃথক করে দেখেননি।
ভ্রান্ত দাবীদাররা উভয়ের তাদের যুক্তি তর্ক দিয়ে নিয়মিত সালাত আদায়কে আবশ্যকীয় করে নবুয়তের উপর তার দায় চাপাতে চেয়েছিল। কিন্তু যাকাত আদায়কে অস্বীকার করার তাদের এদাবী প্রত্যাখ্যাত হতে বাধ্য। এক্ষেত্রে আবু বকর (রাঃ) সক্ষম হয়েছিলেন তার গবেষণা (ইজতিহাদ) দ্বারা কিরামকে যাকাত আদায় অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। সালাত আদায় ও যাকাত জনিত এ জটিল বিষয়টি এভাবেই সুরাহা হয়েছিল। তাঁর এ সিদ্ধান্ত ইসলামকে সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করল। যা ষড়যন্ত্রকারীদের ইসলামের এক একটি করে স্তম্বকে ধ্বংস করার মাধ্যমে ধ্বংস করার পরিকল্পনা ছিল। যদি আবু বকর (রাঃ) এই সিদ্ধান্ত না আসত এবং তাকে অপর সাহাবীগণ সমর্থন না জানাতেন তাহলে ইসলাম তার ভিত্তির উপর দাঁড়াতে সক্ষম হতো না। মক্কা এবং মদীনায় যদি এ ষড়যন্ত্র ও ফিতনাহ (বেসামরিক গৃহযুদ্ধ) পুরো জাযীরাতুল আরবেই ছড়িয়ে পড়ত।[২২]

বিভিন্ন ফিকহী মাসআলাতে (juristic issues) তাঁদের মতানৈক্য

যদি আমরা গভীর সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাওয়া যায়, জটিল জটিল বিষয় তাঁদের নিয়ন্ত্রনে রেখেছেন এবং পরীক্ষান্তে কিছু উদাহরণ আমাদের নিকট বের হয়ে পড়ে যা বিতর্ক ও মতানৈক্যের নীতিমালা অনুসরণ করার জন্য উলামা ও মুসলিম সমাজকে অনুপ্রেরণা যোগায়। বর্নিত বিষয় গুলো ছাড়াও দু'জন জ্যেষ্ঠ সাহাবী আবু বকর ও উমর (রাঃ) এর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। যেমন যুদ্ধবন্দী বিনিময়, যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত জমিন বিতরণ ও মুসলমানদের জন্য অর্থনৈতিক সমতার সুযোগ সৃষ্টি। আবু বকর (রাঃ) মহিলা যুদ্ধ বন্দীদের মুসলিম নিয়ন্ত্রণে রাখার পক্ষে মত দেন। কিন্তু উমর (রাঃ) তাঁর খিলাফাত আমলে এই সিদ্ধান্তকে স্থগিত করতঃ মহিলা যুদ্ধ বন্দীদের স্বাধীন করে দেয়ার সিদ্ধান্ত জারী করেন এবং তাদেরকে তাদের ইচ্ছামত জায়গায় বা পরিবারের লোকদের নিকট ফিরে যাবার সুযোগ দেন। তবে যে সব মহিলার ইত্যাবসবে কোন শিশু সন্তানের মাতা হিসেবে পাওয়া যেত তাদেরকে ঐ জন্মদাতা পুরুষের যিম্মায় ন্যাস্ত করা হতো। এ ধরনের একটি উদাহরন

www.pathagar.com

খাওলাহ্ বিনতে জাফর আল হানাফিয়্যাহ উম্মে মুহাম্মদ বিন আলী (আল্লাহ তাদের দু'জনের প্রতি রহম করুন) এর বেলায় হয়েছিল।

যেভাবে দু'জন মতানৈক্য করেছিলেন যুদ্ধ জয়ের জমিন বন্টন নিয়ে। আবু বকর (রাঃ) বন্টনের পক্ষে আর উমর (রাঃ) ওয়াকফ এর পক্ষে রায় দেন এবং বন্টন প্রথা রহিত করে দেন। মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আবু বকর (রাঃ)সমান ভাবে রাষ্ট্রীয় ভাতা চালু করেন। উমর (রাঃ) এক্ষেত্রে বন্টনের ব্যবস্থা চালু করেন।[২৩]

আমরা খিলাফতের মনোনয়ন প্রশ্নে লক্ষ্য করি যে, উমর কারো জন্য খিলাফতের মনোনয়ন ঘোষনা করেননি, কিন্তু আবু বকর (রাঃ) উমর (রাঃ)কে তাঁর উত্তরসূরী মনোনীত করেন। তারপর তাঁরা দু'জন ফিকহী বিভিন্ন মাসআলাহ'র ক্ষেত্রে মতানৈক্য করেন। তাদের মধ্যে এই ইখতিলাফ একে অপরকে দ্বীনি ভাই চিন্তা করে ভালবাসার গন্ডীর মধ্যে থেকেই করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, আবু বকর (রাঃ) যখন উমর (রাঃ)কে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করলেন কতিপয় মুসলিম লোকেরা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আপনি আপনার রবের নিকট কি জওয়াব দেবেন, যখন আপনাকে উমরের মনোনয়নের প্রশ্ন করা হবে, যখন আপনি তাঁর রুঢ়তার কথা জানতেন। তিনি বললেন, বরং আমি বলব হে আমার রব, আমি তোমার উত্তম বান্দাকে মনোনীত করেছি।[২৪]

আর অন্যদিকে উমর (রাঃ) কে যখন একজন মুসলিম ব্যক্তি বললেন, আপনি আবু বকরের চাইতে উত্তম। উমর (রাঃ) কাঁদতে থাকলেন আর বললেন, আবু বকরের এক রাত্রির ইবাদত উমরের জীবন ও তাঁর পরিবার বর্গের জীবনের চাইতে উত্তম।[২৫]

এই হচ্ছে জ্যোষ্ঠ দু'জন সাহাবীর বিতর্কের নমুনা। তারা মতামতের মধ্যে মতানৈক্য করেছেন কিন্তু অন্তর দু'রকম ছিলনা। কেননা তারা আকাশ ওয়ালার সন্তুষ্টিকে মূখ্য জ্ঞান করেছেন, দুনিয়ার ক্ষমতাকে কোন রূপ তাওক্কাই তারা করেননি।

উমর ও আলী (রাঃ) এর মধ্যকার মতানৈক্য

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) ও আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) মধ্যে বিভিন্ন মতামতের আলোকে মতানৈক্য হয়েছে। কিন্তু তাঁদের এ মতানৈক্যের

www.pathagar.com

মধ্যে উচ্চ মার্গের শিষ্টাচার ও সৌন্দর্য বোধের বিদ্যমান ছিল। নিম্নেবর্ণিত ঘটনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায় :
একবার এক মহিলা, যার স্বামী মারা গিয়েছিল, উমর (রাঃ) তখন খলীফাতুল মুসলেমিন। উমর (রাঃ) এর নিকট বলা হয়েছিল মহিলা তার ঘরে পুরুষদের আসার অনুমতি প্রদান করে। উমর (রাঃ) এটাকে মেনে নিতে পারলেন না। কোন এক ব্যক্তিকে তার নিকট পাঠানো মহিলাকে তার নিকট নিয়ে আসার জন্য। মহিলা খবর শুনার পর উমর (রাঃ) এর নিকট আসার জন্য রওয়ানা হলো। এ অবস্থায় সে সন্তান সম্ভবা ছিল। পথিমধ্যে তার প্রসব ব্যাথা শুরু হলো। সে বাড়ীতে আশ্রয় নেয়ার পর সে একটি সন্তান প্রসব করলো। বাচ্চাটি জন্মের পর দুটি চিৎকার দিয়ে মারা গেল। ঘটনার পর বিষয়টি নিয়ে হযরত উমর (রাঃ) আল্লাহর নবীর (সাঃ) সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তাদের মধ্য থেকে মতামত আসলো এ ব্যাপারে আপনার কোন দায়িত্ব নেই। আপনাকে এ বিষয়ে কিছুই করতে হবেনা। এ অবস্থায় আলী (রাঃ) সেখানে একপাশে চুপচাপ বসা ছিলেন। উমর (রাঃ) তার নিকট বিষয়টির মতামত চাইলেন। আলী (রাঃ) বললেন, সাহাবীগণ প্রকৃত বিষয় অনুধাবন করে মতামত দেয়নি। এর জন্য আপনাকে দিয়াত দিতে হবে। কারণ আপনার কারণে মহিলা আসার পথে বাচ্চা প্রসবের পর মারা যায়। সুতরাং এর জন্য দিয়াত দিতে হবে। উমর (রাঃ) কাল বিলম্ব না করে দিয়াত (আকীলা) বন্টন করে দিলেন।[২৬]

উমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ যিনি সাহাবীগণের মধ্যে কুরআনুল কারীমের বিশুদ্ধ পাঠক ছিলেন এবং আল্লাহর নবীর (সাঃ) সুন্নাহ (হাদীস) এর অধিক বেত্তা ছিলেন। অধিকাংশ সাহাবী তাকে আল্লাহর নবীর (সাঃ) এর পরিবারের একজন বলে জানতেন। কেননা তিনি এবং তাঁর মা রাসূলের (সাঃ) পরিবারের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ট ছিলেন। অনেকের ধারণা ছিল যে, তিনি ও তাঁর মা হয়তো রাসূলের ঘনিষ্ট আপনজন ছিলেন। এর কারণ ছিল যে, তাঁদেরকে রাসূলের বাড়ীতে নিয়মিত দেখা যেত।[২৭] একদিন আবু মাসঊদ আল বারদীর নিকট আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ জানতে চাইলেন কোন বিষয়ে। সে তাকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহর নবী সাহাবীগণের মধ্যে পবিত্র কুরআন নাজিলের বিষয়ে

www.pathagar.com

এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বিষয়ে তাঁর চাইতে অধিক জ্ঞানী আর কাউকে রেখে যাননি। আবু মুসা (রাঃ) তখন বললেন, এই সে ব্যক্তি যিনি রাসূলের সাথেই থাকতেন যখন আমরা রাসূলের নিকট থেকে চলে যেতাম। আর আমরা তাঁর নিকট আল্লাহর নিকট দেখা করার জন্য অনুমতি কামনা করতাম, যখন আমরা রাসূলের বাড়ীর বাইরে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করতাম।[২৮]

উমর (রাঃ) তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও পারঙ্গমতা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। ইসলাম সম্পর্কে তাঁর পান্ডিত্য তিনি জানতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি উমর (রাঃ) কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে অনেক কর্তব্যকাজ সম্পাদন করেছেন। তিনি তাঁর অনেক সিদ্ধান্ত ও সমাধানের ব্যাপারে উমর (রাঃ) সাথে পরামর্শ করতেন। ঐতিহাসিকগণ তাকে এভাবে মূল্যায়ন করেছেন যে, তিনি মীরাসী আইনে উমর (রাঃ) নিকট বেশী বিবেচ্য ছিলেন যতনা ছিলেন অন্যান্য সাহাবীগণ। গবেষণা ও মাসআলার দলীল গ্রহনের ক্ষেত্রে উমর (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সমধারণার প্রয়োগ করতেন। আইনগত বিষয়ে অনেক সমস্যা সমাধানের আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ উমর (রাঃ)-এর সমাধানকে প্রাধান্য দিতেন। উদাহরণ স্বরূপ মীরাসী আইনের অনেক ধাপ ও উপধারার প্রয়োগের ক্ষেত্রে এরূপ লক্ষ্য করা যায়।

এতদসত্ত্বেও তাদের দু'জনের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতোবিরোধ ছিল। বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের মধ্যে মত পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। যেমন ইবনে মাসউদ নামাযের সময় ডান হাত বাম হাতের ওপর রাখার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তিনি দুটো হাত কনুইর ওপর রাখতে নিষেধ করেছেন। উমর (রাঃ) শেষোক্ত মত সমর্থন করতেন কিন্তু প্রথোমক্ত বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করতেন।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) স্বামী যদি স্ত্রীকে 'তুমি আমার জন্য হারাম বা নিষিদ্ধ' বলায় স্ত্রী পরিপূর্ন তালাক প্রাপ্ত হয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু উমর (রাঃ) এক্ষেত্রে কেবলমাত্র এক তালাক হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। পরিপূর্ন ও চুড়ান্ত তালাক গণ্য করার প্রবক্তা ছিলেন না ; বরং এটি তালাকের প্রকার হিসাবে গণ্য করতেন।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) কোন পুরুষ ও নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে অতঃপর দুজনের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হলে বিবাহকে অবৈধ সাব্যস্ত করতেন। অপরদিকে উমর (রাঃ) এতে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন, তিনি প্রথম অংশকে ব্যভিচার পরের অংশকে বিবাহ হিসেবে বৈধ মনে করতেন।[২৯]

www.pathagar.com

ইবনে কাইয়্যিম তাঁর ইলামুল মুকে'য়ীন নামক গ্রন্থে ফিকহী মাসআলার একশতটিতে ইবনে মাসউদ ইখতিলাফ করেছেন, আর তমধ্যে মাত্র চারটি বর্ণনা করা হয়েছে। এসব মতানৈক্য ও মতপার্থক্য তাদের মধ্যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা সন্মানের কোন প্রকার ঘাটতি আনয়ন করেনি। নীচের এ ঘটনা থেকে এ বিষয়ে আরও ভাল ধারণা লাভ করা যায় :

দু'জন ব্যক্তি ইবনে মাসউদের (রাঃ) নিকট আসলেন। তাদের একজন উমর (রাঃ) অনুমোদিত পদ্ধতিতে কুরআন পড়ছিলেন। অন্যজন সাহাবীর মত পড়ছিলেন। প্রথমজন বলছেন উমর (রাঃ) আমাকে এভাবে পড়তে বলেছেন, ইবনে মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবীগণতো অন্যভাবে পড়ছেন। ইবনে মাসউদ এটি শুনার পর বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন আর বললেন, উমরের মতই পড়, কেননা তিনি ছিলেন ইসলামের শক্ত ও সুন্দর প্রতিভা। লোকেরা তার মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করেছে, বিতাড়িত হয়নি। পরবর্তীতে যখন উমর আপনাদের সন্মুখীন হলেন তখন সে মজবুত অবস্থার ঘাটতি হতে লাগলো।[৩০]

একদিন ইবনে মাসউদ (রাঃ) উমর (রাঃ) এর দিকে এগিয়ে আসলেন, উমর (রাঃ) বসা অবস্থায় ছিলেন, যখন ইবনে মাসউদকে দেখলেন, আর অমনি বললেন, ইলম ও প্রাজ্ঞতার ভান্ডার এসেছে।

অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে তিনি বলছেন বিদ্যা ও জ্ঞানের ভান্ডার এসেছে যা দ্বারা কাদিসিয়ার মানুষ উপকৃত হলো। আল্লাহ তায়াল এ দু'জনের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। তাদের দু'জনের মধ্যে মায়া ভালবাসা ও সহমর্মীতা কেবলই ছিল পরস্পরের মধ্যে সন্মানের মাধ্যম। আমাদের জন্য এখানে বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার শিষ্টাচার হিসাবে বিদ্যমান রয়েছে, যে সকল স্থানে আমরা মতবিরোধের সমাধানে পৌছার জন্য উদাহরণ হিসেবে কাজে লাগাতে পারি।

ইবনে আব্বাস ও যায়িদ ইবনে সাবিত (রাঃ)

মতানৈক্যের অধিকন্তু নীতিমালার পাওয়ার জন্য আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারি সাহাবায়ে কিরামের নির্দিষ্ট কিছু বিষয়াবলী ও ঘটনাবলীকে যেগুলোতে তারা মতানৈক্য করেছিলেন। আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) সাহাবীগণের মধ্যে আবু বকর (রাঃ), ইবনে আব্বাস ও সাহাবীগণের একটি অংশ ইজতিহাদ দ্বারা দাদা তার সম্পত্তিতে নাতীদের অংশীদার করবেনা যেখানে তার পুত্র কন্যা তার থাকা অবস্থায় মারা যায়। সেখানে তারা পুত্র কন্যার অবর্তমানে তাদের

www.pathagar.com

সন্তানদের (নাতী–নাতনী) পুত্র কন্যা হিসেবে বিবেচনা করার পক্ষপাতী ছিলেন না। ফলে তারা ওয়ারিশ হিসেবে বিবেচনায় আনার বিরোধী ছিলেন। অপর দিকে যায়িদ ইবনে সাবিত, ইবনে আবু তালিব ও ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং সাহাবী অন্য জনৈক অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, দাদার সম্পদে তার রেখে যাওয়া সন্তানরা প্রাপ্য হিসেবে গণ্য হবে। এ বিষয়ে ইবনে আব্বাস একদিন এভাবে মন্তব্য করলেনঃ তোমরা সাবধান থাকবে যায়িদের ব্যাপারে। সে পুত্রের পুত্রকে পুত্র হিসেবে বিবেচনা করে কিন্তু পিতার পিতাকে পিতা হিসেবে বিবেচনা করে না। তিনি আরো বলেন আমি চাই যদি সম্ভব হতো তাহলে আমি এবং যারা এবিষয়ে মতানৈক্য করে তারা সকলে কাবার হাতিমে (রোকনে কাবা) সকলের হাত রেখে একথা বলে শপথ করতাম যে, মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক।[৩১]

এই বিষয়টি সাহাবায়ে কিরামের ফিকহী মাসআলার মতানৈক্যের একটি উদাহরণ। আমরা এখানে লক্ষ্য করলে দেখি যে, মতানৈক্যের ব্যাপারে তারা তার সৌজন্যতার সীমা কখনও লংঘন করেননি। বরং তারা সৌজন্যতা ও শালীলতা বজায় রেখে এবং অন্যদের প্রতি সমাধানের আশাবাদী ছিলেন। তারা নিজেদের ইজতিহাদী সিদ্ধান্তের প্রতি অত্যন্ত দৃঢ় মনোভাব পোষণ করতেন। মিথ্যা ও শঠতার মাপকাঠিতে কোন সিদ্ধান্ত দিতেননা। যা ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বিষয়ে আমরা লক্ষ্য করি, তিনি নিজের সিদ্ধান্তকে দৃঢ়তার সাথে সঠিক এবং যায়িদের সিদ্ধান্তকে ভুল বলে ঘোষণা করলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) একদিন যায়িদ (রাঃ)-এর আরোহীতে গমনকারী ছিলেন। তিনি তাকে আটকায়ে ধরলেন আর যায়িদ (রাঃ) বললেন, এমন করবেন না, হে রাসূলের (সাঃ) চাচার পুত্র। তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমরা আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিদের এবং আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে এমন বিষয় প্রচলন করে দিতে পারি না (যা তাদেরকে বিভক্ত করে দেবে)। একথা শোনার পর যায়িদ (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে তাঁর হাত বের করার জন্য বললেন, তিনি হাত বের করার পর যায়িত (রাঃ) তার হাতে চুম্বন খেলেন এবং বললেন, কিভাবে তা আমরা করতে পারি। আমরা আল্লাহর নবীর (সঃ) এর পরিবার ভুক্ত সদস্য (আহলে বাইত)।[৩২]

যায়িদ (রাঃ) যখন ইন্তেকাল করলেন, ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, এভাবেই চলে গেলেন[৩৩] বাইহাকী তার সুপানে কুবরায় বর্ণনা করেছেন- এভাবেই ইলম

www.pathagar.com

চলে গেল। অবশ্যই আজ অনেক ইলমকে দাফন করা হলো। [৩৪] উমর (রাঃ) এর অভ্যাস ছিল, তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে ইসলামের বিভিন্ন জটিল মাসআলার জন্য বয়োজ্যেষ্ঠ মুহাজির ও আনসার বদরী সাহাবী এবং অন্যান্যগণের সাথে ডাকতেন।[৩৫]

বস্তুত সাহাবায়ে কিরামের ইখতিলাফ সমূহ যা ফিকহী মাসআলার অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাদের পারস্পরিক আচার আচরণে তাদের যে মতামত প্রকাশিত হয়েছিল, তা আমরা গ্রন্থবদ্ধ করে ফেলতে পারি, কিন্তু তা একান্তই তাদের জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে আমাদের জন্য কোন উদাহরণ হতে পারেনা। আমাদের জন্য কেবল মাত্র এখানে তাই উদাহরণ হতে পারে যা মুহাম্মদ (সাঃ) সাহাবী হিসেবে পরস্পরের মধ্যে আচার আচরণে পেশ করেছিলেন। তাদের সকলের প্রতি আল্লাহ রহম করুন। এই দিকটি নির্দেশক হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে যাতে তাদের একটি একটি দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, আর তা হচ্ছে সাহাবাগণের মতানৈক্য করার একটি সুন্দর পদ্ধতি।

সাহাবাগণের সম্পর্কে যা লিখিত হয়েছে তা সম্পর্কে আল্লাহই ভাল জানেন, তাদের মধ্যে বড় বড় ঘটনা সংঘঠিত হয়েছে। সাহাবাগণের মধ্যে যা সংঘটিত হয়েছে, তা হয়েছে আল্লাহর একত্ববাদের জন্য, দুনিয়ার সকল কিছুই ছিল একেই কেন্দ্র করে। তাঁদের সকল কর্মকান্ড একে ঘিরেই আর্বর্তিত হয়েছে। যখন তলোয়ার দ্বারা তাদের মধ্যে বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছে তখনও আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণ যে আচরণ প্রদর্শন করেছেন তাতে সত্যও বিশুদ্ধ বিষয়কে একপক্ষ অন্য পক্ষকে ঘায়েল করার জন্য ব্যবহার করেননি। অর্থাৎ তাঁরা সত্য ও ন্যায়কে একে অন্যের সামনে পেশ করার চেষ্টা করেছেন। এ ধরনের একটি ঘটনার উপমা আমরা মারওয়ান ইবনুল হাকাম (রাঃ) কে আলী (রাঃ) সম্পর্কে একটি উক্তি থেকে পেয়ে থাকি। আমি আলী (রাঃ) থেকে আর কাউকে দেখেনি। (আমাদের পরাজয়ের পর) এ ঘটনা উষ্ট্রের যুদ্ধের বিষয়ে। সে কিছুই ছিলনা, কিন্তু তিনি ছিলেন আমাদের জন্য প্রতিরোধক। তিনি তাঁর এক লোককে আদেশ দিলেন এ ঘোষণা দেয়ার জন্য যে, কোন আহত ব্যক্তির উপর যেন কোন আক্রমণ করা না হয় বা হত্যা করা না হয়।

অন্যদিকে ইমরান ইবনে তালহা আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন। তখন উষ্ট্রের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। আলী (রাঃ) তাঁকে স্বাগত জানান অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এবং তাকে আলী (রাঃ) এর একেবারে নিকটে বসার জন্য অনুরোধ করলেন। আর বললেন, আমি দৃঢ় ভাবে

www.pathagar.com

বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তোমার পিতা ও আমাকে আল্লাহর বাণীকে বুঝার তাওফীক দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন – তাদের অন্তরে ঈর্ষা-বিদ্বেষ যাই থাকনা কেন, আমি তা দূর করে দেবো, তারা একে অপরের ভাই হয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে অবস্থান করবে (১৫ঃ৪৭)। এর পর তিনি তার পিতার পরিবারের এক এক করে সকলের খোঁজ-খবর নিলেন। তাতে তার পুত্র কন্যা মা ও অন্যান্য আত্মীয়রাও স্থান পায়।

তিনি আরও বলেন, হে আমার ভাইয়ের পুত্র, তুমি আমাকে বল, উমুক কেমন আছে? উমুকের খবর কি? আলোচ্য বৈঠকে এমন লোকেরাও উপস্থিত ছিলেন তারা রাসূলের (সাঃ) সাহাবীগণের মর্যাদা সম্পর্কে উপলব্ধির মধ্যে ত্রুটি ছিল। তাঁরা আল্লাহর নবীর সাহাবীগণ কি অবস্থার মুখোমুখি ছিল তাও অবহিত ছিলেন না। আলী (রাঃ) এর নিকটে অবস্থানকারী দু'জন ব্যক্তি বলে উঠলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সঠিক বিচার করেছেন। আপনি গতকাল যাদের হত্যা করেছিলেন তারা আজ জান্নাতে আপনার ভাই হিসেবে অবস্থান করেছেন। আলী (রাঃ) রাগান্বিত হলেন এবং ঐ দুজনকে বললেন, চুপ করো, এবং আল্লাহর জমীনে যেদিকে যেতে পার চলে যাও। কে উপযুক্ত কুরআনের এই আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা দেয়ার? যদি আমি ও তালহা বর্তমান না থাকি। কে আমাদের চেয়ে উপযুক্ত?[৩৬]

তাদের মধ্যে থেকে আমীরুল মোমেনীনকে প্রশ্ন করা হলো উষ্ট্রীয় যুদ্ধের অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে বলা হলো তারা কি মুশরিক ছিল। তিনি (রাঃ) বললেন, শিরক থেকে তারা পলায়ন করেছে।

আবার বলা হলো তাহলে কি তারা মুনাফিক ছিল তিনি বললেন, মুনাফিকরা আল্লাহকে সামান্যই স্মরণ করে। এরপর তাকে বলা হলো, তাহলে তাদেরকে এই কাজের অনুমতি দিলেন। আলী (রাঃ) বললেন, আমাদের ভাইয়েরা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। তাদের মধ্য থেকে একজন আয়েশা (রাঃ) যিনি নবী করীম (সাঃ) পত্নী ছিলেন, উষ্ট্রের যুদ্ধে তাঁর সংশ্লিষ্টতা নিয়ে সমালোচনা করছিলেন। সেখানে আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। আর আম্মার ইবনে ইয়াসির উষ্ট্রের যুদ্ধের ঘটনায় আয়েশা (রাঃ)এর সমর্থক ছিলেন না একথা তো সবার জানা। তিনি লোকটির কথা শ্রবনে বললেন, চুপ করো তোমরা অকৃতজ্ঞ ও অসহিষ্ণু। কি করে তোমাদের দ্বারা সম্ভব যে, তোমরা নবীর (রাঃ) ভালবাসার পত্নীকে নিয়ে সমালোচনা করবে?

www.pathagar.com

আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, তিনি জান্নাতী নবীর (সঃ) স্ত্রী। তাঁকে তোমরা কষ্ট দিচ্ছ? আমাদের মা তিনি, তাঁর একটি দায়িত্ব পালন করেছেন মাত্র। আমাদের জানা দরকার তিনি দুনিয়া ও আখিরাতের আল্লাহর নবীর (সাঃ) এর স্ত্রী। কিন্তু আমাদের জন্য এটি একটি পরীক্ষা আল্লাহ আমাদের সামনে রেখেছেন নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর পত্নীর প্রতি আমরা কতটুকু অনুগত। [৩৭] এর চেয়ে আর সঠিক আচার-ব্যবহারের উত্তম দৃষ্টান্ত হতে পারে যাদের আল্লাহ দয়া করেছেন, তারা একে অপরের সাথে যুদ্ধেও অবতীর্ণ হয়েছেন? নবুয়তের নূরের যে বিচ্ছুরণ সংঘটিত হয়েছিল এটি তারই ধারাবাহিকতা। যার ফলে তারা আন্তরিক ভাবে সে ধারার অনুসরণে সীমা অতিক্রমের মতো আচরণ করেননি। এই ছিল রাসূলের সাহাবীগণের পারস্পরিক সমালোচনা ও মতানৈক্যের পদ্ধতি এবং আচার আচরণের নমুনা। আল্লাহ তায়ালার জন্য সকল প্রশংসা যিনি উত্তম যুগে উত্তম মানুষগুলোর সমাবেশ ঘটিয়ে ছিলেন যাঁদের মাধ্যমে এ ধরনের মতানৈক্যের শিষ্ঠাচার ও আদর্শিক নমুনা সৃষ্টি হয়েছে।

যিরার বিন সামুরার স্তুতি ও মুয়াবিয়া (রাঃ) এর ক্রন্দন

আবু নাঈম আবু সালেহ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যিরার ইবনে সামুরা আল কিনানী মুআবিয়া (রাঃ) নিকট গমন করেন। তখন তাঁকে বলা হয়, আলী (রাঃ) এর গুণাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করুন। তিনি জবাবে বলেন, আগে আমাকে আশ্বস্থ করুন যে, আমাকে ক্ষমা করবেন, হে আমিরুল মুমেনীন। তিনি বলেন, তোমাকে অবশ্যই ক্ষমা করা হবে। তিনি বললেন, তোমাকে এটা বলতে হবে যে আল্লাহর শপথ, তিনি দূরদর্শী সম্পন্ন, দুর্দান্ত শক্তি সম্পন্ন, তিনি কথা বলেন, খোলা মেলা, বিচার করেন ন্যায় পরায়নতার সাথে, জ্ঞান তার নিকট থেকে বিচ্যুরিত হয়। তিনি কথা বলেন হিকমতের সাথে, তিনি দুনিয়ার চাকচিক্য বিমুখ, তিনি রাতের অন্ধকারে তিনি ক্রন্দনকারী, আল্লাহর শপথ তিনি ছিলেন, চরম উপলব্ধি সম্পন্ন জ্ঞানের অধিকারী। উচ্চাঙ্গের চিন্তাশীল,তিনি নিজেকে সংশোধন করার জন্য চেষ্টা করতেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোষাক পরিধানের বিষয়ে তিনি আশ্চর্য্যবোধ করতেন এবং অতি খাবারকে অপছন্দ করতেন। আল্লাহর শপথ! তিনি আমাদের মতই একজন ছিলেন। তিনি আমাদের আগমনে সানন্দে গ্রহণ করতেন। আমরা কোন প্রশ্ন করলে যথাযথ জবাব দিতেন। তিনি ছিলেন আমাদের অতি নিকটের

www.pathagar.com

মানুষ। আমরাও তার কাছের মানুষ ছিলাম। তাঁর সাথে কথা বলতে কোন ভয় ছিলনা। কেননা তাঁর মুছকি হাসি মনিমুক্তার মত ছিল। তিনি দ্বীনের আহলদের অতিশয় মর্যাদা প্রদান করতেন। মিসকিনদের ভাল বাসতেন। বাতিলের বিরুদ্ধে তাঁর শক্তি লোক তাঁর বিচার দ্বারা বঞ্চনার শিকার হননি।
আমি আল্লাহর নামে সাক্ষী দিচ্ছি যে, তাঁকে বিভিন্ন অবস্থায় দেখেছি, রাতে দীর্ঘ ইবাদাতে মশগুল, রাতের গভীরতায় তিনি অলস হতেন না। তিনি তাঁর দাঁড়ি ক্রন্দনের পানি দ্বারা ভাসিয়ে তুলতেন। তিনি কাঁদতেন অত্যন্ত ভীষণতায় আমি যেন এখনও তা শুনে যাচ্ছি। তিনি যেন বলছেন, হে আমার রব! হে আমার রব! তিনি তাঁর রবের প্রতি যেন একার্ত। দুনিয়ার প্রতি লক্ষ্য করে তিনি বলতেন, কি তোমার প্রয়োজনীয়তা! কি তোমার অভিভাব। আফসুস! আফসুস! তুমি অন্যদের ধোকা দাও! আমার নয় আমি তোমাকে তিন তালাক দিলাম। (অর্থাৎ তোমাকে একে বারে বাদ দিলাম।)হে দুনিয়া! তোমার আয়ু কম, তোমার অবস্থান দৈন্য, তোমার বিনষ্টতা সহজ! আহ! আহ্! আমার সম্বল খুব কম। সফর অনেক লম্বা। রাস্তা খুব কঠিন!
এ অবস্থায় আমীরে মুআবিয়া (রাঃ) এর অশ্রু এত সজল হলো যে, দাঁড়িগুলো ভিজে গড়ায়ে পড়তে থাকলো, তিনি যেন তা ধরে রাখতে পারছিলেন না। তাঁর এ ক্রন্দনে তার সঙ্গীরাও কাঁদতে থাকলেন। মুআবিয়া (রাঃ)বললেন, আবুল হাসান (রাঃ) কি এমন ছিল? তোমার কি পরিমাণ বেদনা তার ব্যাপারে হে যিয়াব। তিনি বলেন, আমার বেদনা তার একাকী গৃহে তাঁর হত্যা যখন প্রত্যক্ষ করলাম তা অবলোকন করার বেদনা, এসব বলে তিনি দাড়িঁয়ে গেলেন এবং চলে গেলেন।[৩৮]

খোলাফায়ে রাশেদার যামানায় মতানৈক্যের উন্নত নীতিমালা

আমাদের চিন্তা চেতনায় যা ধরা পড়ে তাতে মতানৈক্যপূর্ণ কোন ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে নিজেদের খেয়াল-খুশীর বশবর্তী হওয়ার কোন অবস্থা পাওয়া যায় না। তাদের মত পার্থক্যে এমন নীতিই লক্ষ্য করা যায়, যা সত্যের জন্য নিবেদিত ছিল। যাতে ইখতিলাফের এই শিক্ষাই প্রতিভাত হয় সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যখন রিসালাতের যুগ শেষ এবং অহী নাজিল হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তা নিম্নরূপ :

www.pathagar.com

১. তাঁরা মতপার্থক্যকে যথাসম্ভব পরিহার করার জন্য চেষ্টা করতেন।

২. তারা মত পার্থক্য বিষয়ে অন্যের জন্য কোন উদাহরণ হিসেবে পেশ করতেন না। অথবা কোন মত পার্থক্যকে মৌখিক হিসেবে মান করতেন। অথবা কোন শব্দকে সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সত্য দ্বারা জবাব দেয়ার চেষ্টা করতেন। দোষ-ত্রুটিকে কখনও বিরোধ হিসেবে চিহ্নিত করতেন না; যে কারণে তারা জ্ঞানী ও মর্যাদাবান ও চিন্তাবিদের জন্য অতিশয় মর্যাদা দিতেন। নিজেদের কখনও অতি মাত্রায় বাড়তে দিতেন না। অপর ভাইয়ের মর্যাদায় কখনও আঘাত হানতেন না। তাঁরা তাদের সকল বিষয়ে পারস্পরিক সিদ্ধান্ত বিবেচনা করতেন। সত্য এমন ভাবে বিবেচিত হতো যে, তা সবকিছুর পর অবশিষ্ট। এক্ষেত্রে সত্যই সবার পরে গ্রহণযোগ্য।

৩. তাদের ভ্রাতৃত্ব ছিল ইসলামের মৌলিক ভ্রাতৃত্ব। যা ইসলামের নীতিমালার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এটা ছিল মতানৈক্যের চেয়ে অনেক বড়। আর এই প্রাধান্যতা ইজতিহাদী বিষয়ে বিবেচিত হতো।

৪. কোন মত পার্থক্য বিষয় চূড়ান্ত বিবেচিত হতো না। ফলে কোন মতানৈক্যই বিভক্তির দিকে ঠেলে দেয়ার সুযোগ হতো না।

৫. উসমান (রাঃ) খিলাফাতের আমলে অধিকাংশ সাহাবী মদীনায় ছিলেন মক্কায় ছিল কম, তারা কেউই যুদ্ধ বিগ্রহে অনুপস্থিত থাকতেন না। তারা সকলে একই জায়গায় ফিরে আসতেন, ফলে তাদের ঐক্যবদ্ধতা (ইজমা) সহজতর ছিল। তাদের এ ধরনের ইজমা বিশ্লেষণধর্মী ও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল বিভিন্ন বিষয়ে।

৬. তাদের মধ্যে কারিউল কুরআন ও ফুকাহাগণ সমাজের মধ্যে উচ্চ মর্যাদাশীল ছিলেন। তাঁরা রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদার অধিষ্ঠিতদের সমকক্ষ বিবেচিত হতো। তাদেরকে তাদের কাজের ক্ষেত্রে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা হতো। বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে তাদের অনুমোদন ছিল এবং পারস্পরিক সংশ্লিষ্ট তাদের ঐক্যবদ্ধ এত অটুট হতো যে, যা পরস্পরের জন্য সাদৃশ্যপূর্ণ হতো।

৭. তাঁরা একজন অন্যজনের বিষয়কে এমন ভাবে সংশোধন করতেন যেন সে তাঁর একজন সহযোগী ভাই। তাদের এই পরিমার্জন এমন হতো না যে, তা অপর ভাইয়ের কোন ভুল সংশোধনী বা বাতিল করার পর্যায়ে হতো না।

www.pathagar.com

তাবেয়ীগণের যুগে মতানৈক্য ও তাদের নীতিমালা

উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) যখন মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রধান ছিলেন, তখন তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনার কৌশল সমূহের মধ্যে অন্যতম ছিল যে, আনসার ও মুহাজিরীনগণ সমূহের মধ্যে আশেপাশের এলাকায় বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাদের জন্য কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সফরের জন্য বাইরে যাওয়ার অনুমোদন ছিল। তারা শিক্ষার প্রসারে দায়িত্ব পালন করতেন। তাদেরকে প্রশাসনিক ও বিচারকের দায়িত্ব পালনে প্রেরণ করা হতো। এছাড়া বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব তাদের বিভিন্ন এলাকায় প্রেরন করা হতো। কাজ শেষে তাদের আবার মদীনায় ফিরে আসার নির্দেশ থাকত। তারা কেউ মুসলিম সাম্রাজ্যে কোন স্থায়ী বাসস্থান তৈরীর সুযোগ ছিল না। তারা সাধ্যমত ইসলামের দাওয়াত পৌছাতেন। খলীফার পক্ষে তারা দায়িত্ব পালন করতেন, নিজেদের দায়িত্ব পালন কালে তারা নিজেদের পরিপূর্নভাবে উম্মাহর জন্য নিবেদিত করতেন।

হযরত উসমান (রাঃ) যখন দায়িত্ব নিলেন, তিনি কোন অসুবিধা অনুভব করেননি এ ব্যাপারে যে, সাহাবীগণ মদীনায় থাকা বা অন্যত্র নিজেদের বসবাসের জন্য স্থানান্তরিত হওয়া। এ অবস্থায় ফকীহ সাহাবীগণ বিভক্ত হয়ে পড়লেন। ফলে বসরা ও কুফার আবাসস্থল করে নিলেন। তাদের সংখ্যা তিন শতাধিক সাহাবী ছিলেন। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মিশর ও শাম প্রদেশে নিজেদের স্থায়ী নিবাস গড়ে তুললেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্নিত রয়েছে যে, রাসূল (সাঃ) যখন হুনাইন যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফিরে আসেন তখন মদীনায় ১২ হাজার সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। রাসূলের(সাঃ) ইন্তেকালের সময় ১০ হাজার সাহাবী মদীনায় বর্তমান ছিলেন, অর্থাৎ তখন ২০০০হাজার সাহাবী অন্য এলাকার স্থানান্তরিত হয়ে যান।[৩৯]

সাহাবায়ে কিরামের উত্তরসূরীগণ

সাহাবাগণের ফিকহ ও জ্ঞানের বহনকারী তাবেয়ীগণ ছিলেন অনেক। যেমন সায়িদ ইবনে মুসাইয়িব[৪০] যাকে উমর (রাঃ) এর বর্ণনাকারী ও মদীনার ফকীহ বিবেচনা করা হতো। আতা ইবনে আবী রিবাহ মক্কায় তাওস (রহঃ) ইয়াসানে ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাছীর ইয়ামামায়। হাসান (রহঃ) বসরায়। মাকহুল সাম প্রদেশে, আতা (রহঃ) খুরাসানে আলকামাহ (রহঃ) কুফায়।

www.pathagar.com

এছাড়া অন্যান্যগণ বিভিন্ন এলাকায়। তাঁরা সকলেই প্রচুর পরিমানে ফতওয়া প্রদানে এবং ইজতিহাদে সক্ষম ছিলেন। যারা সকলেই রাসূল (সাঃ) এর সাহাবীগণের নিকট থেকে ইলম ও ফিকহের যোগ্য বহনকারী ছিলেন। সাহাবীগণের রেখে যাওয়া সম্পদকে তারা স্বযত্নে লালন করেন। তাদের শিষ্টাচারকে তারা তাদের শিষ্টাচার হিসেবে গ্রহণ করেন। তাদের রেখে যাওয়া কর্মপদ্ধতিকে তারা তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। তারা সাহাবীগণের নীতি থেকে বের হননি যখন তারা কোন মতানৈক্যের সন্মুখীন হয়েছেন। তাদের এ আদর্শকে কখনও তারা লংঘন করেননি। তারাই ঐসকল ফিকহর বিশেষজ্ঞ ছিলেন যাঁরা উম্মাহর অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন। নিম্নের মতানৈক্য থেকে তাদের অনুসৃত মতপার্থক্যের নীতির প্রমাণ পাওয়া যায় যা নিম্নরূপঃ

আবদুর রাজ্জাক শাবীর সূত্রে[৪১] বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি সুরাইহ নিকট আসলেন এবং আংগুলের দিয়াত (ক্ষতিপূরণ) সম্পর্কে জানতে চাইলেন, তিনি বলেন, প্রতি আঙ্গুলের জন্য ১০টি উট, ব্যক্তিটি বললেন সুবহানাল্লাহ (তর্জুনী ও বৃদ্ধাংগুলির প্রতি ইংগিত করে) এসব কি সমান। সুরাইহ বললেন, কেন সুন্নাহ এই ধরনের কিয়াসকে নিষিদ্ধ করেছে। সুতরাং মান্যকর , নতুন কথা বলা থেকে বিরত থাক।

রবীয়াহ সূত্রে ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় বর্ণনা করেন, আমি সায়িদ ইবনে মুসাইয়িবকে জিজ্ঞাসা করলাম মহিলাদের আংগুলের দিয়াত কি তিনি বলেন, ১০টি উট, দুটি আঙ্গুলে? তিনি বলেন, ৩০টি। আমি বললাম যদি চারটি আংগুল হয়? তিনি বললেন, ২০টি উট। আমি বললাম কেন? সে বেশী পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হলো, অধিক কষ্টে পড়ল। আর দিয়াত কমে গেল? সায়ীদ (রহঃ) বললেন, তুমি কি একজন ইরাকী? রাবীয়াহ বললেন, আমাকে একজন বুৎপত্তি সম্পন্ন জ্ঞানী অথবা মূর্খ শিক্ষার্থী বিবেচনা করুন। সায়ীদ (রহঃ) বললেন, হে ভাইয়ের পুত্র এই হচ্ছে সুন্নাহ।[৪২]

ঘটনাটি শেষ হলো যেভাবে তাতে দেখা যায় একপক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত দেয়ার পর অন্যপক্ষ থেকে অন্য সিদ্ধান্ত ছাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়নি। অথবা নিজেকে এ ব্যাপারে অজ্ঞ বলে বিবেচনা করেছেন অন্য পক্ষকে বাতিল বলে আখ্যা দেয়া হয়নি।

সায়িদ ইবনে মুসাইয়িব ও হিজাজ বাসীদের মতামত ছিল মহিলার দিয়াত পুরুষের মতই যতক্ষণ না তা তিন পর্যন্ত পৌছায়। যদি ৩০-এর অধিক

www.pathagar.com

দিয়াতের অবস্থায় পৌঁছায় তাহলে পুরুষের অধিক দিয়াত প্রযোজ্য হবে। এটি ঐ হাদীসের দ্বারা সাব্যস্ত যা উমর ইবনে শোয়াইব তার পিতা থেকে তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন মহিলাম দিয়াত পুরুষের মতই যতক্ষণ না তা তিন পর্যন্ত পৌছে[৪৩] আর ইরাকীদের মাজহাব হচ্ছে মহিলার দিয়াত পুরুষের অর্ধেক প্রথম থেকে। আরেকটি উদাহরণ এখানে পেশ করা যায়, যা ইমাম শাবী জনৈক ব্যক্তির সাথে কিয়াস সম্পর্কে কথা বলেন। ইমাম শাবী তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, মনে করো আহনাফ ইবনুল কায়েস হত্যাকৃত হলো, সাথে তার ছোট একটি ছেলেও হত্যাকৃত হলো, দু'জনের দিয়াত কি এক হবে? না কি তার আপনজনেরা বা বহনকারীরা পৃথক পৃথকভাবে দিয়াত আদায় করবে। ঐ ব্যক্তি তখন বললেন, বরং সমান সমানই হবে। কিয়াস এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এখানে ইমাম শাবী বিষয়ের ইতি টানলেন।

আল আতওয়ারী (রহঃ) ইমাম আবু হানিফার সাথে মক্কায় দেখা করলেন। আতওয়ারী বললেন, কেন আপনি রুকুর আগে ওপরে হাত তোলেন না? আবু হানিফা (রহঃ) জবাব দিলেন। রাসূল (সাঃ) থেকে এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ কোন উক্তি নেই। আতওয়ারী বললেন, কিভাবে। আয্ যুহুরী সালেম থেকে তিনি পিতা থেকে তার পিতা তার দাদা রাসূল (সাঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি (সাঃ) হাত উত্তোলন করতেন। যখন তিনি নামায আরম্ভ করতেন। রুকু শুরু করার সময় এবং রুকু থেকে উঠার সময়। আবু হানিফা বললেন, হাম্মাদ ইবরাহিম থেকে তিনি আলকামা এবং আসওয়াদ থেকে ইবনে মাসউদ সূত্রে বর্ণনা করেন রাসূল (সাঃ) হাত উত্তোলন করতেন না একমাত্র নামায শুরু ব্যতিত। এছাড়া একাজ দ্বিতীয় করতেন না। আওযারী বললেন, তার মতে আবু হানিফার বর্ণনাকারীগণ থেকে তার বর্ণনাকারীগণ অধিক উপযুক্ত। তিনি প্রতি উত্তরে আরো বলেন, হাম্মাদ অধিক জ্ঞানী ছিলেন আল যুহুরী থেকে, ইবরাহিম সালেম থেকে অধিক জ্ঞানী, আলকামাহ নিম্ন পদমর্যাদার ছিলেন না ইবনে উমর থেকে। যদি ইবনে উমরকে রাসূলের সাহাবী গন্য করা হয় তাহলে অলি আসওয়াদের অনেক গুনাবলী রয়েছে। আর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ তো আছেই। তখন আওযারী চুপ থাকলেন।[৪৪]

আবু হানিফা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে তিনি বলেন, আমাদের যা সিদ্ধান্ত আমরা কাউকে তা মানতে বাধ্য করিনা এবং এ কথাও বলিনা যে, কারও পরে

www.pathagar.com

এটার প্রতি অসুন্তুষ্টি সহকারে মান্য করা ওয়াজিব। যদি এ বিষয়ে তাদের নিকট উত্তম কোন দলীল থাকে তাহলে তাতে তারা আমল করবে। [৪৫]
এখানে সকল একমত পোষণ করলেন। যখন বিশুদ্ধ সুন্নাহ পাওয়া গেল তখন কেউ তার বিরোধীতা করলেন না। আর যা বিতর্ক করেছেন তা মাত্র তাদের বুঝার ব্যাপারে। আর প্রত্যেকেই অনেক বুঝার (ব্যাখ্যার) বিষয়কে সমর্থন করেন যতক্ষণ পর্যন্ত শব্দগত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হতো। কিন্তু আর বিশুদ্ধ দলীল পাওয়া ব্যতিত প্রতিপক্ষের প্রতি কোন আপত্তি আরোপ করা হতো না।

রাজনৈতিক মতানৈক্যর প্রভাব বিশ্বাস ও আইনগত মত পার্থক্যের উপর

এই বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আমাদের চিহ্নিত করতে হবে যে, যে মতানৈক্য রাসূলের যুগ ও তৎপরবর্তী প্রথম পর্যায়ের মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল,তা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলামী আইন ও বিধি বিধান বিষয়ে। সেখানে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার ছিল সকল মতানৈক্য তারা খুব দ্রুত সমাধান করতেন কুরআন ও সুন্নাহর দলীল দ্বারা। সকল পক্ষ একটি সুন্দর আচরণ দ্বারা সকল বিষয়ে সমাধানের পথ খুজতেন, খোলা মেলা মহান রাসূলের অনুসৃত নীতির আলোকে। সত্য হিসাবে প্রতিভাত হওয়ার পর তারা যে কোন বিষয়ে নিজেদেরকে পরিষ্কার ভাবে পেশ করার জন্য চেষ্টা করতেন।
পূর্বে আলোচনায় আমরা যা লক্ষ্য করেছি, যত মতানৈক্য তাদের নিকট দেখা দিয়েছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর কোন উদ্ধৃতি (text) কে একপক্ষ বুঝার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অপর পক্ষ সে ব্যাপারে সেভাবে জানার বুঝার অভাব হেতু মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। আর তাদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে খোলামেলাভাবে যুক্তি তর্ক আকারে বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আকারে যা কুরআন ও সুন্নাহর কোন বাক্য বা শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।
মতানৈক্যের ভিন্ন মাত্রায় আমরা সন্ধান পাই অন্য একটি বিষয়ে যা ছিল রাজনৈতিক মত পার্থক্য দ্বারা। যা জন্ম দিয়েছিল এমন একটি মারাত্মক ফিতনা যাতে তৃতীয় খলীফা গিয়েছিল এমন একটি মারাত্মক ফিতনা যাতে তৃতীয় খলীফা উসমান (রাঃ) নিহত হয়েছিলেন। খিলাফতের কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়ে যায় মদীনা থেকে কুফায়। তার পরে আবার দামেস্কে আর এর মাঝে পেশীশক্তির মাধ্যমে নতুন বিপর্যয়ের জন্ম নিয়েছিল। আর এসব বিপর্যয় মূলক ঘটনাবলী মতানৈক্যকে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে দেয়। আর এগুলো

www.pathagar.com

সহযোগিতা করে প্রত্যেক শহর বা এলাকায় আল্লাহর নবীর (সাঃ) সুন্নাহ কে উপলক্ষ করে বিভক্তির দিকে ধাবিত হতে। আর তাদের দৃষ্টি ভঙ্গিকে এ পর্যায়ে নিয়ে গেল যে, অন্য শহর বা এলাকার সাথে তাদের মতানৈক্য দ্বারা নিজেদের শহর বা এলাকাকে সংরক্ষনে বাধ্য করল। ফলে তা রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উদ্ভবে অথবা বিপরীত অবস্থানে নিতে প্রভাব বিস্তার করে। আর তারা ইরাককে দুটি মহান স্থানে চিহ্নিত করে একটি কুফা অন্যটি বসরা। এগুলোর প্রতি বাইয়াত গ্রহনে রাজনৈতিক চিন্তা, গুরুত্ব ও মতামত তাদেরকে একটি সুস্পষ্ট মতানৈক্যের দিকে নিয়ে যায়। এরই মাধ্যমে তৈরী হয় শিয়া[৪৬] সম্প্রদায়, প্রকাশ পায় জাহমিয়া[৪৭] সম্প্রদায়, মুতাযিলা[৪৮] সম্প্রদায়, খারেজীদের[৪৯] বিস্তার ঘটে, নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুবর্তী বিদআত বিস্তার ঘটে। শুরু হয়ে যায় জাল হাদীস তৈরীর প্রবণতা। নতুন নতুন রাজনৈতিক যুদ্ধের কাহিনী প্রস্তুত হতে থাকে। মানুষের তৈরী মতাদর্শের অনুসরণের প্রবনতা দেখা দেয়। এমনকি ইমাম মালেক কুফা প্রসঙ্গেঁ বলেন, এটা তো মারামারির শহর [৫০]। যুহুরী বলেন, আমাদের নিকট থেকে হাদীস বের হয়ে যায় হাতের আকারে ইরাকে গিয়ে সেটি গজে পরিণত হয়।[৫১]

এইসব কাজগুলো ইরাকী ফুকাহাগণের দ্বারা সংঘটিত হয়। তারা সুন্নাহ ও আখবারকে গ্রহণ করার জন্য এমন সব শর্তাবলী জুড়ে দিয়েছিল যা তাদের পূর্বসূরীদের মধ্যে ছিলনা। এটা তারা এই লোভে করেছিল যে, যাতে করে তাদের ফিকহ শাস্ত্রে তাদের তৈরী করা চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বিদাআত ও বিভক্তিপূর্ণ অবস্থা যা তাদের উপর বিপর্যয় আকারে দেখা গিয়েছিল তা প্রতিরোধ করতে পারে। এই অবস্থায় যারা হিজাজের অধিবাসী ছিল তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, ইরাক ও দামেস্কবাসীর হাদীস গ্রহণযোগ্য হবেনা যদি তার মধ্যে হিজাজবাসীদের মূল বিদ্যামান না থাকে।[৫২]

হিজাজের একজন আলিম এ প্রসঙ্গে বলেন, সুফিয়ান সাওরীর হাদীস মানসুর থেকে, ইব্রাহিম নখয়ী থেকে, আলকামা আন নখয়ী থেকে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ প্রমুখ থেকে। এই সনদ ইরাকীদের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু হিজাজী আলিমগণের মৌলিক সূত্র যদি সনদে না পাওয়া যায় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবেনা।[৫৩]

আল আব্বাস রাবীয়াহ ইবনে আবু আবদুর রহমানকে[৫৪] নিয়োগ করে মদীনা থেকে তাকে মন্ত্রী ও উপদেষ্টার পদ মর্যাদা দেয়া হয়। অল্প সময়ের মধ্যে তার

www.pathagar.com

নিয়োগ বাতিল করা হয় এবং মদীনায় ফেরত নেয়া হয়। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইরাকীদের ব্যাপারে তার চিন্তা কি? তিনি জবাব দিলেন, আমি দেখলাম এক ব্যক্তি নিষিদ্ধ বলে প্রচার করছে আমরা যাকে বৈধ বিবেচনা করি আর বৈধ বলে ঘোষণা করেছি যাকে আমরা নিষিদ্ধ বিবেচনা করি। আমি যখন ইরাক ত্যাগ করছিলাম তখন দেখলাম ৪০ হাজার ব্যাক্তি যারা দ্বীন নিয়ে ষড়যন্ত্র লিপ্ত ছিল। তিনি আরও বলেন, আল্লাহর নবী (সাঃ) যিনি আমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন, আর তাদের নিকট ভিন্ন আরেকজন নবী প্রেরিত হয়েছিল।[৫৫]
এই কথা গুলো প্রমাণ করে যে, তারা ছিল বিভক্তির পথে এবং ইরাকে বিদআত প্রসারিত করার ব্যবস্থা আর তা সুন্নাহ ও সাধারণ মুসলমানদের মতামতের ভিত্তিতে ছিলনা। তারা কিছু বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা দেয়ার চেষ্টা করছিল সূদূর দৃষ্টি ভঙ্গির আলোকে ইসলামী আইনকে প্রভাবিত করার জন্য এবং দুই প্রদেশের ফকীহগণের মনমানসিকতা পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের খন্ডিত মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করা।

ইরাকী ও হিজাজী স্কলারবৃন্দ

হিজাজের অধিবাসীদের ধারণা ছিল যে, তারা সুন্নাহর উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। তাদের নিকট থেকে কোন কিছুই বাদ যাচ্ছে না। ফলে মদীনা ছিল দশহাজার সাহাবীর অবস্থান স্থল। হুনাইন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর আল্লাহর রাসূল তাদের নিকট থেকে বিদায় নেন। তারা ওফাত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। উমর ইবনে আব্দুল আজীজ বিভিন্ন এলাকায় এই বলে চিঠি লিখেছেন ইসলামী সুন্নাহ ও ফিকহ শাস্ত্রকে যথাযথ ভাবে গুরুত্ব দেয়ার জন্য। কিন্তু যখন তাদের নিকট এটা তিনি লিখেছেন তখন সুন্নাহ ও ফিকহ পালন করার বিষয়ে লিখার চেয়ে তাদেরকে অপরের নিকট প্রচার করা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং তাদের মদীনার পূর্ব অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যও এ চিঠি লেখেন। যারা সুন্নাহ ও ফিকহ সাহাবা বহন করে নিয়ে ঐতিহ্যবাহী হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব, তার মধ্যে থেকে সনদ প্রাপ্ত হয়েছেন মালেকী, শাফী, হানাবেলা, জাহেরিয়া এবং মদীনার অন্যান্য উলামা ও তাবেয়ীগণ। তারা মতামত ব্যক্ত করেছিলেন যে, তাদের নিকট সুন্নাহর পর্যাপ্ত দলীল বিদ্যমান রয়েছে যা দ্বারা প্রয়োজনীয় বিধি বিধানের

www.pathagar.com

সমাধান করার জন্য উপযুক্ত। তারা এটাও মনে করত তাদের পক্ষে সমাধান যোগ্য এমন কোন বিষয় নেই। এই প্রেক্ষাপটে তারা তাদের বিপরীতে অবস্থান কারীদের বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করল। আর তারা নিজেদের সিদ্ধান্তকে এমন ভাবে প্রচার করতে থাকল যে, তাদের এ বিষয়ে উপাধী হিসেবে নামের সাথে যুক্ত হতে থাকল। যেমন– রবীয়াহ ইবনে আবু আবদুর রহমান যিনি ইমাম মালেকের উস্তাদ ছিলেন তার সিদ্ধান্তবলী রবীয়াহ সিদ্ধান্ত বা রায় নামে অভিহিত করা হতো। অধিকাংশ মদীনার ফিকহবিদগণ এর মধ্যেই ছিল,যারা এমন বিশেষজ্ঞ ছিলেন তারা সুন্নাহ ও আছার দ্বারা নিজেদের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

ইরাকী ফিকহবিদগণ এর বিরুদ্ধে ছিলেন। যেমন– ইব্রাহিম নখয়ী এবং তার ছাত্রগণ। তাদের দাবী ছিল যে, সুন্নাহর সাথে তাদের সম্পর্ক ছোট নয়। তাদের সাথে প্রায় ৩শ' সাহাবী বসবাস করছেন, যারা উচ্চাঙ্গের জ্ঞানের অধিকারী। যাদের অধিকাংশই ফিকহবিদ ছিলেন। তাদের অগ্রভাগে ছিলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, যিনি কুরআনের জ্ঞান সম্পর্কে রাসূলের (সাঃ) জ্ঞানী সাহাবীগণের অন্যতম। এছাড়া আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) তাঁর খিলাফত আমলে তাদের মধ্যেই ছিলেন। আবু মুসা আশয়ারী ও আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) সহ অন্যান্যরা ছিলেন তাদের সাথে। ইব্রাহিম নখয়ী[৫৬] ও তার অনুসারী অধিকাংশ ফিকহবিদগণ মনে করতেন যে, শরীয়াহ বিধি বিধানগুলো সম্পূর্ন চিন্তা ও যৌক্তিকতার ভিত্তিতে নির্নিত হবার দাবী রাখে। যদি বিষয়গুলো জনকল্যানের জন্যও হয়। তারা নিজেরা জ্ঞান ও বুদ্ধিভিত্তিক বিধি বিধানের জন্ম দিল। তারা যুক্তি ও অবস্থাকে ফিকহে সংযুক্ত করার বিষয়গুলো এগুলোর মাধ্যমে বাস্তবায়ন হতে হবে। ইরাকী ওলামাগণ মনে করতেন, শরীয়াহর দলীল গুলোতো প্রবাহমান নেই আর ঘটনাবলীতো প্রবাহমান। কেননা শরীয়াহর নস বা মূল সূত্রাবলী রাসূলের ইন্তেকালের সাথে স্যাথে বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং এ ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া মানুষের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটানো সম্ভব নয়।

আল হাসান ইবনে উবায়দুল্লাহ আন নখয়ী বলেন, আমি ইব্রাহিম নখয়ীকে বললাম, আপনি কি আপনার সকল ফিকহী সিদ্ধান্ত শুনে দিয়ে থাকেন। তিনি বললেন না, আমি বললাম, তাহলে কি না শুনে, তিনি বললেন,আমি শুনি এবং শুনি না তা আমার নিকট নিয়ে আসা হয়। তারপর যা শুনি তার সাথে আমি মিলিয়ে দেখি এবং সিদ্ধান্ত প্রদান করি। এটি ছিল ইরাকী শিক্ষা কেন্দ্রগুলো

www.pathagar.com

নীতিমালা যার মূল কথা ছিল রায় বা সিদ্ধান্ত প্রতিপাদ্য হবে যদি আসর (হাদীস) অনুপস্থিত থাকে।[৫৭]

অপরদিকে সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব ও মদীনার আলিমগণ এর প্রতি আসক্ত ছিলেন না। তারা আহকাম শরীয়াহকে নাম ও আছার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতেন। তাদের মতে কিভাবে তা সম্ভব যা রাসূল (সাঃ) করেননি, আবু বকর (রাঃ), উমর, উসমান, আলী (রাঃ) করেননি। একমাত্র তাদেরকে যেভাবে রাসূল শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া।[৫৮]

যেমনিভাবে বাইয়াতে মদীনায় ঐ সকল ঘটনাবলী হয়নি যা ইরাকী বাইয়াতে সংঘটিত হয়েছে। আর মদীনায় এমন সব ঘটনা ঘটেনি যা ইরাকে ঘটেছে। এই কারনে মদীনার উলামাগণ তাদের নিকট কোন প্রশ্নের জবাব দেব আর না হয় কোন মাসআলার ব্যাপারে তিনি বললেন জানি না, তিনি বললেন, এ জাতীয় কোন মাসআলার সাথে মিলিয়ে দেখ (কিয়াস), কেননা আমার ভয় হয় যদি আমার পা পিছলিয়ে যায়।[৫৯]

এখানে যেটি স্পষ্ট হয়ে যায়, তা হচ্ছে, আহলে মদীনাগণ হাদীসে কোন সিদ্ধান্ত না থাকলে তারা সিদ্ধান্ত দেয়ার বিরোধী ছিলেন। ইবনে ওহাব তেমনটি বলতেন। মালিক (রহঃ) বলেন, "আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তিনি মুসলমানদের ইমাম ছিলেন, সারা পৃথিবীর নেতা ছিলেন। তিনি কোন সিদ্ধান্ত দিতেন না যতক্ষণ না আসমান থেকে অহীর মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্ত না আসতো। যখন রাসূল (সাঃ) আসমানের অহী ছাড়া সিদ্ধান্ত দিতেন না, সেখানে এটা কি করে সম্ভব যে, কোন ব্যক্তির কাজকে মহতি কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে যে তার নিজের থেকে সিদ্ধান্ত দেবে! অথবা যুক্তি দ্বারা অথবা কোন অভিজ্ঞতা দ্বারা অথবা কোন রীতি প্রথা দ্বারা অথবা কোন রাজনীতির দৃষ্টান্ত দ্বারা কিংবা স্বপ্ন দ্বারা, কিংবা অগ্রাধিকার নীতি দ্বারা। আল্লাহ সাহায্যকারী, তার উপরই নির্ভরশীল।"[৬০]

উপরোক্ত মতপার্থক্য যা দুই অফলের ফকীহ ও আলিমগণের চিন্তার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে তারা পরস্পরের প্রতি সমালোচনার বিনিময় করেছেন সুন্দরভাবে। কিন্তু তারা সেখানে আচরনগত শিষ্টাচার বিনষ্ট করে কোন মতপার্থক্যে যাননি। আমরা পরিষ্কার ভাবে তাদের এমন অবস্থাই লক্ষ্য করেছি যা বর্ণনা করা হয়েছে। দুই পক্ষের স্কলারগণ এই অবস্থার মধ্যে ব্যস্ত থাকতে দেখা গেছে। তারা এমন আচরণ প্রদর্শন করেননি যা দ্বারা সীমা লংঘন তো করেননি বা অবিশ্বাসী ও আদর্শচ্যুত হওয়ার প্রমাণও তাতে বহন করে না।

www.pathagar.com

অথবা তাতে গুণাহ্জনিত পদক্ষেপ কিংবা ইসলামের দৃষ্টিতে কোন অন্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়।

ইবনে আবু সাবরামাহ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি এবং আবু হানিফা জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফী নিকট প্রবেশ করলাম। আমি তার বন্ধু ছিলাম। আমি জাফরের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম। আমি তাকে বললাম, এই ব্যক্তি ইরাকের অধিবাসী। তিনি জ্ঞানী ও বুৎপত্তি অর্জনকারী। জাফর আমাকে বললেন, সম্ভবত তিনি সে ব্যক্তি যিনি দ্বীনকে তার নিজের রায় দ্বারা বিবেচনা করেন। তারপর বললেন, তিনি কি নোমান? আবু হানিফা বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করুন। জাফর বললেন, আল্লাহকে ভয় করুন, নিজের মত অনুযায়ী দ্বীনের সিদ্ধান্ত দেবেন না। কেননা প্রথম যে ব্যক্তি কিয়াস করে সিদ্ধান্ত দিয়েছিল সে হলো ইবলিশ। যখন তাকে আল্লাহ আদমকে সিজদা করতে বললেন, সে বলেছিল আমি তো তার থেকে উত্তম। আমাকে আগুন দ্বারা তৈরী করা হয়েছে আর তাকে মাটি দ্বারা। তারপর আবু হানিফাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমাকে আপনি বলুন এমন একটি কথা বললেন, যার প্রথমটি শিরক এবং এর শেষটি ঈমান। আবু হানিফা বললেন, জানি না। জাফর বললেন, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ। যদি কেউ বলল লা ইলাহা তারপর চুপ থাকল তাহলে কাফির হয়ে গেল। এজন্য এই বাক্যটির প্রথমটি শিরক আর শেষটি ঈমান। এখন আপনার নিকট জানার বিষয়, আল্লাহ নিকট কোনটি বড় গুণাহ। হত্যা যা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন অথবা ব্যভিচার। আবু হানিফা বললেন, বরং হত্যা। জাফর বললোন, আল্লাহ হত্যার ব্যাপারে দুই জনের সাক্ষী গ্রহণ করেছেন কিন্তু যিনার জন্য চার জনের সাক্ষী ছাড়া গ্রহণ করেননি। তাহলে আপনি কিভাবে কিয়াস করবেন। তারপর বললেন, নামায রোজার মধ্যে কোনটি আল্লাহর নিকট বড়। আবু হানিফা বললেন বরং সালাত। জাফর বললেন, ঐ মহিলার কি হবে যার হায়েজের জন্য সাওমের কাযা করতে হয় কিন্তু নামাযের জন্য সাওমের কাযা করতে হয় কিন্তু নামাযের কাযা করতে হয় না। সুতারাং হে আল্লাহর বান্দা, কিয়াস করবেন না। আল্লাহকে ভয় করুন। আমরা (আমি ও আপনি) দুজনই আগামীকাল আল্লাহর সামনে দাঁড়াবো। যেদিন আল্লাহ বলবেন, রাসূল বলেছেন, আপনি ও আপনার সাহাবীগণ বলবেন, আমরা কিয়াস দ্বারা আমাদের সিদ্ধান্ত দিয়েছি) সেখানে আপনার ও আমার সাথে আল্লাহ তাই করবেন যা তিনি ইচ্ছা করেন। [৬১]

www.pathagar.com

এখানে দেখার বিষয় হচ্ছে, ইমাম জাফর কর্তৃক যে সকল প্রশ্ন আবু হানিফাকে করা হয়েছিল সেগুলোর জবাব দেয়া তার জন্য কঠিন ছিলনা। কিন্তু তিনি চুপ থাকলেন এবং কোন প্রত্যুত্তরে গেলেন না শুধমাত্র আহলে বাইতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নিমিত্তে যেখানে জাফরের মত ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

এই মতবিনিময় ও বিতর্ক দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, উচ্চ মানের শিষ্টাচার তাদের মধ্যে বিদ্যামান ছিল যাদেরকে মহান নবী (সাঃ) প্রভাবিত করেছিলেন যারা তার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তারা এই উদাহরণও পেশ করেছেন যে, পদ্ধতিগত মতপার্থক্য এবং মতামত দেয়ার অর্থ এই নয় যে,ঈমানী ভাইয়ের সাথে কোন বিবাদের সৃষ্টি করা এবং তাদের মধ্যে কোন বিভক্তির দেয়াল তৈরী করে দেয়া। ঐতিহাসিকগণ যা এই বিষয়ে বর্ণনা করেছেন যে, যা তাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা তাদের মধ্যে সম্মান সূচক বাক্য বিনিময়ের প্রমাণ বহন করে। যা তাদের বিভক্তি ছিল তা তাদের বিশ্বাসগত কাজের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। তাদের কেউ কেউ অন্যদের কুফুরীর, ফাসেকীর অথবা বিদআতের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ তাদের মধ্যে মতপার্থক্যের সুন্দর শিষ্টাচারকে যথাযথভাবে তাদের বর্ণনায় স্থান দিতে ভুল করেননি।

খারেজীদের সঙ্গে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বিতর্ক

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের নিকট থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, আকরামা ইবনে আম্মার বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,আমাকে সামাকুল হানাফী বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছি, আলী (রাঃ) বলেছেন, তাদের হত্যা করোনা (খারেজীদের) যতক্ষন না তারা বের হয়ে যায়। অচিরেই তারা বের হয়ে যাবে। ইবনে আব্বাস বলেন, হে আমিরুল মোমেনীন! নামাজ শেষ করুন। আমি চাই তাদের সাথে কথা বলতে। তাদের মধ্যে গন্য হওয়ার ব্যাপারে ভয় পাচ্ছি। ইবনে আব্বাস বললেন, আমি তাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রের ব্যক্তি ছিলাম। আমি কাউকে কষ্ট দেইনি। এরপর তিনি ইয়ামেনী কাপড় পরিধান করলেন যা তার নিকট ছিল। তিনি ছেঁটে চললেন, খারেজীদের শিবিরের দিকে। তারপর তাদের নিকট প্রবেশ করলে তারা বললো,তারা আমাকে বললো, এই কি পোশাক! আমি তখন কুরআন তিলাওয়াত করে তাদের শুনালাম–

www.pathagar.com

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

অর্থ : বলুন! কে হারাম করেছে আল্লাহর সৌন্দর্যকে যা আল্লাহ তার বান্দাদের দিয়েছেন এবং ঐ পবিত্র রিজিক যা তাদের দেয়া হয়েছে। (সুরাহ আরাফ ঃ ৩২)
আমি আরও বললাম, আমি রাসূলকে দেখেছি তিনি ইয়ামেনী উত্তম কাপড় পরিধান করেছেন। তারা বললেন, এতে কোন দোষ নেই। তবে বলুন! কেন এখানে এসেছেন। আমি বললাম, আমি এসেছি আমার এক সঙ্গীর নিকট থেকে। যিনি রাসূলের চাচার পুত্র এবং তাঁর সাহাবীও। আল্লাহ রাসূলের (সাঃ) সাহাবীগণ অহীর জ্ঞান দ্বারা তোমাদের চেয়ে বেশী জ্ঞানী। কারণ তাদের মাঝে কুরআন নাজিল হয়েছে। আমি তার নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছি। এখন বলুন, আপনাদের নেতৃত্ব দেবেন কে? তাদের কেউ বললেন, তার সাথে কথা বলতে সাবধান। নিশ্চয়ই কুরাইশরা কলহপ্রবণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, বরং তারা হচ্ছে কলহপ্রবণ জাতি। (যুখরুফ : ৫৮)
তাদের মধ্য থেকে আরেকজন বললেন, তার সাথে কথা বল, এবং তাদের মধ্য থেকে দুই বা তিন জন আমার সামনে আসল। আপনি যা চান আমাদের বলতে পারেন, আমাদের যা চাই তা আমরা বলব। আমি বললাম, আপনারা বলুন! আলী (রাঃ) এর ব্যাপারে তিনটি অভিযোগ। প্রথমত তিনি নির্দেশনার জন্য ব্যক্তিকে ক্ষমতা দিয়েছেন। অথচ আল্লাহ বলেছেন–

إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ

অর্থ : সকল নির্দেশ বা বিধান জারীর একমাত্র মালিক আল্লাহ। (আনআম ঃ ৫৭, ইউসুফ ঃ ৪০)
আমি বললাম, আল্লাহ তায়ালা তার নির্দেশনার মধ্যে এটা রেখেছেন যে, ব্যক্তি শিকারের জন্য চায় দিরহাম প্রদান করবে।[৬২] আর স্বামী ও স্ত্রীর ফয়সালার ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীর মতানৈক্যের ক্ষেত্রে দু'জনের পরিবারের পক্ষ থেকে ১জন করে বিচারক প্রেরণ কর। (নিসা ঃ ৩৫)
এখন বলুন এখন কোনটি উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ, স্বামী ও স্ত্রীর বিচারক তো তাদের ঝগড়া মিটানোর জন্য এবং কলহ দূর করার জন্য এবং উম্মাহর ঐক্য টিকিয়ে রাখার জন্য। এখানে তারা একমত হলো,কিন্তু অন্য বিষয়ে তারা বিতর্ক করলো যে, আলী (রাঃ) আমিরুল মোমেনীন তাহলে আমিরুল মোমেনীন ও আমিরুল কাফিরুন কে? ইবনে আব্বাস বললেন, আমি যদি

www.pathagar.com

কুরআন পড়ে শুনাই এবং হাদীসে রাসূল থেকে বর্ণনা করি তাহলে কি তোমরা তার প্রতি ফিরে আসবে। তারা বললেন হ্যাঁ। আমি বললাম, তোমরা শুনেছ অথবা পরোক্ষভাবে দেখেছো, যা হুদাইবিয়ার ঘটনায় ঘটেছিল। সুনাইল ইবনে উমর রাসূল (সাঃ) এর নিকট সমঝতোর জন্য আসলেন। রাসূল (সাঃ) আলী (রাঃ) কে বললেন আপনি লিখুন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি। সে আপত্তি জানাল। আল্লাহর রাসূল ঐ অংশ 'রাসূলুল্লাহ' মুছে ফেলতে বললেন। যদি আল্লাহর রাসূলকে আল্লাহর রাসূল বলা না যায় তাহলে কেন আমরা আলী (রাঃ) কে আমীরুল মোমেনীন বলা থেকে বিরত থাকতে পারবোনা। এই ইস্যুতে তারা সন্তুষ্ট হলো।

তৃতীয় অভিযোগ তাদের আলী (রাঃ) এর বিরুদ্ধে। তিনি সিফফীনের ও উষ্ট্রীয় যুদ্ধের সংঘটিত ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, সেখানে যুদ্ধবন্দী ও গনীমতের মালের ব্যাপারে আয়শা (রাঃ) সাথে সঠিক আচরণ করেননি। ইবনে আব্বাস (রাঃ) তখন বললেন, তোমরা তোমাদের মা আয়েশা (রাঃ) যিনি নবী করীম (সাঃ) পত্নী তার নিকট থেকে সম্পদ যুদ্ধের লুণ্ঠিত সম্পদ হিসেবে নিতে চাও? যদি তোমরা এর জবাবে হ্যাঁ, বলো তাহলে তোমরা কিতাবুল্লাহর সাথে কুফুরী করবে এবং তোমরা ইসলাম থেকে বের হয়ে পড়বে। ইবনে আব্বাস পুনরায় কুরআন হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা পেশ করলেন। তখন তাঁর আলোচনায় তারা খুশী হলো। এই ইস্যুতে তারা সম্মতি দিয়ে মেনে নিল। ফলাফল হিসেবে এ আলোচনায় যা দাঁড়াল তা হচ্ছে তারা এই চ্যালেঞ্জকে অতিক্রম করলো এবং খারেজীদের বিরাট অংশ পুনরায় আলী (রাঃ) দলে ফিরে গেল। কিন্তু অধিকাংশ থেকে গেল তাদের মতামতে। তারা তাদের তরবারী খোলা রাখলো এবং তৈরী থাকলো তাদের মতের বিরুদ্ধাবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। তারা তাদের জীবন ও সম্পদকে একটি আইনসিদ্ধ প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসার ব্যাপারে বিবেচনা করলো। তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিলনা যে, যারা বিতর্কে অংশ নেয়ার এবং সত্যকে মেনে নেয়ার ব্যাপারে একমত ছিলেন না। তাদের অনেকে বিরুদ্ধবাদীদের আহবানে সাড়াও দিয়েছিল। যখন তারা কুরআন নিয়ে বিতর্কে অংশ নিতেন তারা এতে সহানুভূতি মূলক ব্যবস্থা নিত এবং আন্তরিকতার সাথে পরস্পরের আলোচনায় অংশ নিত। এই উদ্ধৃতি ও আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের মুসলমানদের প্রতি প্রশ্ন আরোপিত হয় যে, কোথায় তাদের মধ্যে সে মানসিকতা যা সে সময়ের মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

www.pathagar.com

---

১. সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ ফাতহুল বারী, ৭ম খন্ড পৃঃ ৩১৩,আইনী ৮ম খন্ড, পৃঃ ২৫৪, মাতানুল বুখারী ৫ম খন্ড পৃঃ ৪৭ কিতাবুল মাগাযীতে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে এবং সালাতুল খাওফে পূরনালোচনা রয়েছে। ইমাম মুসলিম হাদীসটি কিতাবুস সালাতে বর্ণনা করেছেন।

২. ইবনে কাইয়্যিম (রহ)-এর গ্রন্থ ইলমিল মাওকিয়াইন দ্রঃ।

৩. পারস্য সাম্রাজ্যের একটি স্থানের নাম। এখানে যুদ্ধটি হয়েছিল বলে এ নামে অভিহিত করা হয়।

৪. আবু দাউদ – ৩৩৪, বুখারী ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারী ১ম খন্ড পৃঃ ৩৮৫,নাইনুল আউতার ১ম খন্ড পৃঃ- ৩২৪।

৫. বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) এ হাদীস ঐক্যমতে বর্ণনা করেছেন। জামিউস সাগীর ২য় খন্ড পৃঃ ৫০১। যেমনিভাবে আবু দাউদ, নিসায়ী আহমদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ'র সূত্রে ফাতহুল কাবীর গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। ৩য় খন্ড, পৃ ঃ-৩৫২।

৬. এজন্য দেখুন, অসূলুল কাফী ২১৬, ১ম খন্ড।

৭. আবু দাউদ আঘাত প্রাপ্ত স্থান তায়াম্মুম করা অধ্যায়ে হাদীস নং ৩৩৬,
ইবনে মাজাহ্ নং–৫৭২, নাইলিল আওতার ১ম খন্ড নং – ৩২৩।

৮. এই হাদীসের কিছু শব্দের ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে
এ জন্য দেখুন বোখারী – হাদীস নং- ৩৯৮ (৭ম খন্ড)

৯. ইবনে হাজম, (মিন ফাতওয়াছ ছাহারা) আহকাম ২য় খন্ড ৮৪-৮৫, রাজেঈ ২য় খন্ড (১২৬- ১২৭)।

১০. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্ ১ম খন্ড/ ২৯৮।

১১. ইমাম বোখারী, আলজামীউস সানীর ২য় খন্ড; পৃঃ-৪৯৪

১২. ইবনে আহকাম ফি অসুলিল আহকাম, ৫ম খন্ড, পৃঃ-৬৬

১৩. প্রাগুক্ত, আরও দ্রঃ বুখারী, অধ্যায় ১৩তম খন্ড পৃঃ ২৮৯ এবং অধ্যায় ৯ম খন্ড, পৃঃ-২২-৩৬.

১৪. বোখারী ,মুসলিম আহমদ, নিসায়ী, জামিউস সাগীর ১ম খন্ড, পৃঃ-৮৬ এবং ফাতহুল কাবীর, ১ম খন্ড, পৃঃ-২১৮।

১৫. ফাতহুল বারী ৮ম খন্ড, পৃঃ- ৬৬

১৬. ফাতহুল বারী, ১৩তম খন্ড পৃঃ- ২১৯- ২২৮.

১৭. আল আহকাম ২য় খন্ড পৃঃ ১২৫, তাফসীর ইবনে কাসীর ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৫২, তাফসীরে তিবরী ২৪ খন্ড পৃঃ ৩০২ এবং সীরাতে ইবনে হিশাম ২য় খন্ড, পৃঃ – ৬৫৫।

১৮. সীরাতে ইবনে হিশাম ২য় খন্ড পৃঃ ৬৬১- ৬৬৬, এখানে আরো বর্ণনা করেছেন তিনি (উমর) হযরত আবু বকরের হাতে বাইয়াত কালেও তিনি এ কথাগুলো মসজিদে উচ্চারণ করেছেন।

১৯. প্রাগুক্ত এবং তিরমিযী হাদীস নং– ১০১৮।

২০. তাফসীরে আল তাবারী দশম খন্ড, পৃঃ ৬২।

২১. বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারী ৩য় খন্ড, পৃঃ ২১১।

২২. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য (আবু বকর ওউমর (রাঃ) এর মধ্যকার অনুষ্ঠিত বিতর্ক) দেখা যেতে পারে, নাইলিল আওতার ৪র্থ খন্ড, পৃঃ- ৩১১।

২৩. ইবনে হাযম, আল আহকাম ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৭৬।

২৪. তাবাকাত ইবনে সাদ তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ১৯৯ ও তাবাকাতে কামিল ২য় খন্ড, পৃঃ ২৯২।

২৫. এর জন্য দেখুন, হায়াতুস সাহাবা ১ম খন্ড ,পৃঃ ৬৪৬।

২৬. মুসলিম হাদীস নং- ১৬৮২ আবু দাউদ, নিসায়ী, ইবনে হাববান (মাসহুল) ২য় খন্ড পৃঃ- ৭৬।

www.pathagar.com

২৭. সহীহ মুসলিম ও আহকাম, ইবনে হাযম ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা– ৬৩।
২৮. প্রাগুক্ত।
২৯. আল আহকাম, ১ম খন্ড, পৃঃ-৬১।
৩০. ইলামুল মুকেয়ীন, ২য় খন্ড পৃঃ– ২১৮।
৩১. আল মাহছুল (হাশীয়া) ২য় খন্ড পৃঃ–৭৬ এবং ১৮১।
৩২. কানযুল উম্মাল ৭ম খন্ড পৃঃ ৩৭,হায়াতুস সাহাবা তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ৩০।
৩৩. ইলামুল মু'কীন ১ম খন্ড – পৃঃ ১৮।
৩৪. সুনানিল বাইহাকী ২য় খন্ড, পৃঃ ২১১ মাহছুল ২য় খন্ড পৃঃ ৭৭।
৩৫. মুহান্নেফ আবদুর রাজ্জাক নং- ৩০৪৮৯ মাহছুল, ১ম খন্ড -২১৭।
৩৬. হায়াতুস সাহাবাহ ৩য় খন্ড, পৃঃ- ১২ ও তাবাকাত ইবনে সাদ ৩য় খন্ড, পৃঃ ২২৪।
৩৭. পুর্বোক্ত ও কানযুল উম্মাল, ৭ম খন্ড,১৬৬ ও হায়াতুস সাহাবাহ্ ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৪।
৩৮. হুলিয়া ১ম খন্ড, পৃঃ ৮৪ আবদুল বার তার ইসতিয়াবে বর্ণনা করেছেন। ৩য় খন্ড, পৃঃ ৪৪ যারমাজিও একইভাবে বর্ণনা করেছেন।
৩৯. আল ফিকরুস সামি ১ম খন্ড, পৃঃ ৩১১।
৪০. আল ফিকরুস সামি ১ম খন্ড, পৃঃ ৩১১।
৪১. তিনি শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ী ছিলেন। নেতৃস্থানীয় শিক্ষাবিদ ছিলেন। তিনি ১৫ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৯৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাবাকাত কুবরা লিইবনে সাদ, খুলাছা তাহজীবুল কামাল, তাহজীবুত তাহজীব,তাকরীবুত তাহজীব, বিদায়াহ এছাড়া নতুন ও পুরাতন বিষয় নিয়ে লেখাগ্রন্থ।
৪২. মুছান্নাফ, ফিকরুস সামী ১ম খন্ড পৃঃ ৩৯১ ইবনে মানযার বর্ণনা করেছেন আর সনদকে বিশুদ্ধ বলেছেন।
৪৩. আল মুয়াত্তা, যামরানী এর শরাহ লিখেছেন ৪র্থ খন্ড পৃঃ১৮৮ মুছান্নাফ আবদুর রাজ্জাক ৯ম খন্ড, পৃঃ ৩৪৯ সুনামে বাইহাকী ৮ম খন্ডপৃঃ৯৬। নিসায়ী ৮ম খন্ড পৃ৫৪ দারুকুতনী ৪র্থ খন্ড পৃঃ ৩৬৪
৪৪. আল ফিকরুস সামী ১ম খন্ড, পৃঃ ৩২০।
৪৫. আল ইনতিকা পৃঃ ১৪০।
৪৬. আশ শিয়া ঃ এটি ইসলামী বিভক্ত গ্রুপ। তাদের এ নাম করণের কারণ ছিল যে, তারা আলী (রাঃ) ও তার বংশধরদের পক্ষাবলম্বন করে। তারা প্রবক্তা ছিল রাসূলের পর খিলাফতের জন্য একমাত্র তারাই উপযুক্ত ছিল তারা ইমামতকে রিসালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যকোন মানুষের জন্য খিলাফত উপযুক্ত নয়, ফলে তা নির্বাচন বা ইখতিয়ারের কোন সুযোগ নেই যেমনি ভাবে নবুওতের মধ্যে এগুলোর কোন সুযোগ নেই এ মতাদর্শে তারা বিশ্বাসী ছিল। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সিদ্ধান্তপূর্ণ দলীলের জন্য মনোনীত ছিলেন। তারা সকল গুনাহ থেকে নিষ্পাপ ছিলেন যেমনি নবীগণ ছিলেন এদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে উপ-গ্রুপ তৈরী হয় যেমন, ইমামীয়্যাহ, যায়দিয়্যাহ ইত্যাদি কিন্তু উপরের এসব বিষয়ের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ ছিল। আলী (রাঃ) ও ইমামগনের আহলে বাইত বিবেচনা করা, কথা কাজে তাদের বিরুদ্ধাচরনের তারা বিপক্ষে ছিল। আহলে সুন্নাহর আদর্শের কাছাকাছি ছিল যায়দীয়্যাহ গ্রুপ তারপর ইমামিয়্যাহ গ্রুপ। তারা তাদের স্বপক্ষে বইপত্র রচনা করে। অসুলুল কাফি, তার ব্যাখ্যা গ্রন্থ, আছলুল শিয়্যাহ ও অসুলুহা, আল মিলাল ওয়ান নিহাল লিস সাইরিস্তানী, ফজল ইবনে হাজম,ওয়াল ফারক বাইনাল ফারক, ইতিকাদাত ফারকুল মুসলিমীন। তাবায়াত মাকতাবাতু কুল্লিয়াতিল আজহারিয়্যাহ, ওয়াল ফারকুল ইসলামিয়্যাহ, ওয়াল হুরুল আইন, ওয়াত তাবছীরু ফিদ দ্বিন তাবায়াত আলামুল কুতুব

www.pathagar.com

৪৭. জাহমিয়্যাহ ঃ এটি অপর একটি গ্রুপ। যারা জাহম ইবনে ছাফওয়ানের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। যিনি ১২৮ হিজরীতে নিহত হন। তাদের মতামত ছিল আল্লাহ সব বলে দেন, এরপর মানুষের কোন স্বাধীনতা বলতে কিছুই নেই। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত মানুষের যেখানে আর বলার কিছু নেই বা পরিবর্তনের চেষ্টা করার কোন সুযোগ নেই। জান্নাত ও জাহান্নামে আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মানুষ চলে যাবে, কোন সৃষ্টির জন্য সেখানে কিছু করার নেই। ইতিকাদাত ফিরকাহ আল মুসলিমীন, আল তাফসীর ফি আলদ্বীন গ্রন্থে এসব বিস্তারিত বলা রয়েছে।

৪৮. মুতাযিলা ঃ এই গ্রুপটি তারা যারা নিজেদের বিশাল জ্ঞানী মনে করে। তারা নিজেদের তাওহীদ ও আদলের জন্য ধারক ও বাহক মনে করে। তাদের বিশ্বাস হচ্ছে তারা কোন বস্তুতে বিশ্বাসী নয় যা আল্লাহ শুরু এবং শেষ না করেন। তাদের মতে আল্লাহ কর্তৃক দেয়া কোন গুনে গুনান্বিত নয় বরং তারাই নিজেদের অর্জিত গুনে গুনান্বিত। কুরআন আল্লাহর দেয়া বাণী নয় বরং নবীদের সৃষ্টি করা একটি বিষয়। তারা বান্দা কর্তৃক সংশোধনের প্রবক্তা তাদের পাঁচটি অছুল বা নিয়মাবলী রয়েছে। এর উপর তাদের মাজহাব প্রতিষ্ঠিত। তাদের মধ্যে অনেক উপদল রয়েছে। এর জন্য বিস্তারিত জানতে হকিকাদাতু ফারকুর রাজী, ওয়াত তাবছীরু ফিদ দ্বীন, ওয়াল মিলাল ওয়াল নিহাল, মিন তাবায়াত আজহার, ওয়াল ফারকু বাইনাল ফারকু।

৪৯. আল খাওয়ারিজ ঃ এটি একটি ধর্মীয় উপদলের নাম। যারা আলী (রাঃ) ও মুয়াবিয়াহর মধ্যে সংঘটিত শাসনতান্ত্রিক ঘটনাবলীর পর বের হয়ে যায়। তারা নিজেদের জন্য কতিপয় বিশ্বাস ও পথের সৃষ্টি করে। তাদের বিশ্বাস ও মতামত ছিল বান্দা কাফির হয়ে যায় কোন গুনাহ করার মাধ্যমে। এজন্য বিশ্বাস ছিল মহান সাহাবীগন কুফুরী করেছেন। তাদের মধ্যে উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ), তালহা (রাঃ), যুবায়ের (রাঃ),আয়েশা (রাঃ)। তাদের এ সম্পর্কিত বিস্তারিত জানার জন্য আল ফারকু লিররাযী, ওয়াত তাবছীর ফিদ দ্বীন, ওয়াল মিলাল ওয়ান নিহাল, মিন তাবায়াতিল আজহার, ওয়াল ফারকু বাইনাল ফারকু।

৫০. আল ফিকরুস সামী ১ম খন্ড, পৃঃ ৩১৩

৫১. আল ইনতিকা

৫২. আল ফিকরুস সামী ১ম খন্ড, পৃঃ ৩১২

৫৩. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩১২

৫৪. রবীয়াহ ইবনে আবদুর রহমান (মৃত্যু ১৩৬ হিজরী) যিনি একজন ফিকহবিদ এবং ইমাম মালিকের প্রখ্যাত শিক্ষক ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন।

৫৫. আল ফিকরুস সামী ১ম খন্ড, পৃঃ ৩১২।

৫৬. ইব্রাহিম নখয়ী (মৃত্যু ৯৬হিজরী) যিনি অবস্থার আলোকে রায় প্রদানের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে ফিকহ এর জন্য বিশ্বস্ত মনে করতেন। তিনি হাদীস ও ফিকহকে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত মনে করতেন। তিনি ইন্তেকাল করলে ইমাম শাবী বলেন, ইব্রাহিম চলে গেলেন, তার মত আর কেউ বেঁচে থাকল না।

৫৭. আল ফিকহী ওয়াল মুতাফাক্কিহ ১ম খন্ড, পৃঃ ৩০১

৫৮. তাবাকাতে ইবনে সাদ

৫৯. ইলমুল মাওয়াকীন লি ইবনে হাজম, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৫৭।

৬০. ইলমুল মুকীন ১ম খন্ড, পৃঃ ২৫৬ (দারুল জাবাল অধ্যায়)

৬১. পূর্বোক্ত। ১ম খন্ড, পৃঃ ২৫৫-২৫৬।

৬২. সুরায়ে মায়েদার ৯৫নং আয়াতের দিকে ইংগিত করে তিনি বললেন।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

উম্মাহর বিধি বিধান বাস্তবায়নে মতানৈক্য

ফিকহী মাযহাব সমূহ ঃ

সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর ফিকহী বিষয়ে যে মাযহাব সৃষ্টি হলো, তারা তেরটি মাযহাব দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। তারা সকলেই নিজেদের আহলে সুন্নাহ বলে পরিচিত করতে প্রয়াস পায়। তাদের মুসলিম আয়িম্মাহ ও সাধারন মুসলমানগণ সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। তাদের মধ্যে আট বা খাটি গ্রুপ ছাড়া অন্যরা ফিকহ বিষয়ে প্রয়োজনীয় অবদান রাখতে পারেনি। তাদের এই কার্যক্রম নানা আঙ্গিকে ও নীতির মধ্যে পরিচালিত হয় । এক গ্রুপ অন্য গ্রুপের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে এই বিধি বিধানের বাস্তবায়ন করার জন্য চেষ্টা নিয়োজিত করে। একে অন্যের বিপরীতে অবস্থান নিজেদের মত করে তাদের মাযহাব এবং বিধি বিধানের কর্মপদ্ধতি পরিচালনা করে তারা নিম্নরূপভাবে মাযহাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ঃ

প্রথমতঃ ইমাম আবু সায়ীদ আল হাসান ইবনে ইয়াসির আল কাছরী, মৃত্যু - ১১০ হিজরী।

দ্বিতীয়তঃ ইমাম আবু হানিফা আন নুমান ইবনে সাবিত ইবনে যাওতী, মৃত্যু- ১৫০ হিজরী।

তৃতীয়তঃ ইমাম আওযায়ী আবু উমর আবদুর রহমান ইবনে উমর ইবনে মুহাম্মদ, মৃত্যু- ১৫৭ হিজরী।

চতুর্থতঃ ইমাম সুফিয়ান ইবনে সায়ীদ ইবনে মাসরুক আস সাওরী, মৃত্যু ঃ ১৬০ হিজরী।

পঞ্চমতঃ ইমাম আল লাইছ ইবনে সাদ, মৃত্যু ঃ ১৭৫ হিজরী।

ষষ্ঠতঃ ইমাম মালিক ইবনে আনাসুল আছবাহী, মৃত্যু ঃ ১৭৯ হিজরী।

সপ্তমতঃ ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, মৃত্যু ঃ ১৯৮ হিজরী।

অষ্টমতঃ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আশ শাফেয়ী, মৃত্যু ঃ ২০৪ হিজরী।

নবমতঃ ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল, মৃত্যু ঃ ২৪১ হিজরী।

www.pathagar.com

এছাড়া ইমাম দাউদ ইবনে আলী ইবনে আসবিহানী আল বাগদাদী যিনি আজ জাহেরী হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তিনি কুরআন ও সুন্নাহর শাব্দিক অর্থকে সরাসরি গ্রহণ করার প্রবক্তা ছিলেন। মৃত্যু ঃ ২৭০ হিজরী।
এছাড়াও অনেকের নাম উল্লেখ করার রয়েছে। ইসহাক ইবনে রাহবিয়াহ মৃত্যু ঃ ২৩৮ হিজরী। আবু সাওর ইব্রাহিম ইবনে খালিদ আল কালবী মৃত্যু ঃ ২৪০ হিজরী। এরা সকলে তাদের মাযহাবকে প্রচার করেননি। ফলে তাদের অনুসারীর সংখ্যা বেশী হয়নি। তারা প্রসিদ্ধ মাযহাবের অনুসারী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। যে সকল ইমামগণের মাযহাব শেষ দিকে প্রচারিত হয়ে অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে। তাদের মতালম্বীগণ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। আর যাদের নীতিও অসুল সমূহ খুব শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বিচার ফয়সালার জন্য গৃহিত হয়েছে তাঁরা মূলত চার ঃ আবু হানিফা, মালিক শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)।

প্রসিদ্ধ ইমামগণের নীতি পদ্ধতি সমূহ

তিনজন প্রসিদ্ধ নেতৃস্থানীয় ইমাম, মালিক, শাফী ও আহমদ ইবনে হাম্বল তাদের ফিকহী নীতিমালায় হাদীসকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তারা সাহাবীগণের গৃহিত নীতিমালাকে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাদের ফিকহী নীতিমালা ও পদ্ধতি মদীনার মুসলমানদের বক্তব্য ও উদ্ধৃতি দ্বারা সনাক্তকৃত ছিল। আর আবু হানিফা (রহঃ) এর নীতি ও পদ্ধতি তাদের অনুসরনে ছিল যারা স্বনির্ভর সিদ্ধান্ত প্রনেতা ছিলেন (আহলুর রায়)। এইসব ইমাম তাদের জীবদ্দসায় তাদের গৃহিত নীতি ও পদ্ধতির প্রচারক ছিলেন। এক্ষেত্রে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় সায়ীদ ইবনে আল মারীয়াহ, তিনি প্রবক্তা ছিলেন বিভিন্ন বিধি বিধানের এবং সাহাবীগণের অনুসৃত নীতির আলোকে,ফলে তিনি মালিকিয়্যাহ, শাফিয়িয়্যাহ ও হানাবেলাহগণের সমর্থক ছিলেন। এবং তিনি ইব্রাহিম নাখয়ীর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তার নীতিছিল যদি সাহাবায়ে কিরামের অনুসৃত নীতি না পাওয়া যায় তাহলে কেবলমাত্র নিজস্ব মতামত দেয়ার সুযোগ রয়েছে। তার সমর্থিত ইমামগণের মাযহাবের সঙ্গে তার এই স্বাভাবিক মত পার্থক্য দেখা যায়। এই মাজহাবের বিভিন্নতা ক্রমাগত পালনের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা

www.pathagar.com

যায়, দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যখন খিলাফত আব্বাসীয়দের কাছে চলে যায়। এই অবস্থায় এ নীতির বাস্তবায়নে আব্বাসীয়গণ প্রসিদ্ধ কিছু ইমামকে হিজাজ ও ইরাকে নিয়ে আসে এজন্য যে, তারা সুন্নাহর প্রচলন করবেন এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে। এই ইমামগণের মধ্যে রাবীয়াহ ইবনে আবদুর রহমান ইয়াহইয়া ইবনে সাদ ইরাকী[১] হিশাম ইবনে উরওয়াহ[২] এবং মাহমুদ ইবনে ইসহাক[৩]।

এ সময়ে ইরাকের কিছু ইমামগণ মদীনায় গমন করেন। এবং সেখানকার ইমামগণের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহিম[৪] এবং মুহাম্মদ ইবনুল হাসান[৫] ইমাম মালেকের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন। ফলে একটি পারস্পরিক মতবিনিময় মূলক ধারণা তৈরী হয় ইরাকী ও মদীনার ইমামগণের মধ্যে। আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে, তিনজন ইমাম মালিক শাফেয়ী ও হাম্বলের মধ্যে কম মতপার্থক্য করেছেন, বরং তাদের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান দেখা যায়।

ইমাম আবু হানিফার নীতি ও পদ্ধতি

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর কর্মপদ্ধতির সারাংশ তার স্বীয় বক্তব্য থেকে উদ্ধৃত করা যায়। তিনি বলেনঃ "আমি প্রথমতঃ আল্লাহর কিতাবের মধ্যে দলীল খোঁজ করি, যদি আমি কোন সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করি। যদি সেখানে আমি কোন দলীল খোঁজ করে না পাই, তাহলে আমি সুন্নাহর দলীল দ্বারা তা সমাধানের জন্য চেষ্টা করি। যা আল্লাহর নবীর (সাঃ) হাদীস হিসেবে স্বীকৃত। আর এক্ষেত্রে সেগুলোই আমি গ্রহণ করি যা সনদের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগণের সূত্রে প্রাপ্ত। যদি কুরআন ও সুন্নাহতে আমি কোন রেফারেন্স খোঁজ করে না পাই, তাহলে সাহাবীগণের উদ্ধৃতি খোঁজ করি। সেখানে আমি তাঁদের একজনের বক্তব্যের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য চেষ্টা করি না। যদি আমার গবেষণায় ইব্রাহিম নখয়ী, আল শাবী, অথবা ইবনুল মুসায়্যিবের মত ব্যক্তিদের সমসাময়িক রেফারেন্স পেয়ে যাই তখন আমি নিজেই ইজতিহাদের মাধ্যমে সমাধান করি সে নীতিতে তারা সমাধানের জন্য ইজতিহাদ করেছিলেন।"

এই হচ্ছে প্রধান নীতিমালা যা ইমাম আবু হানিফা কর্তৃক পরিপালিত হতো। এটাই ছিল তাঁর মাযহাবের মৌল বিষয়। এছাড়া কিছু কিছু সমার্থক ও দ্বিতীয়

www.pathagar.com

স্তরের নীতিমালা ব্যবহার করার প্রমাণ পাওয়া যায়, যা তার সঙ্গে অন্যান্য স্কলারগনের সঙ্গে মতপার্থক্য দেখা যায়। যেমন–

সাধারণ (আম)[৬] বিষয়ে তিনি প্রকারভেদে দলীল কিতয়ী বা নির্দিষ্ট দলীল দ্বারা একে নির্ধারিত বিষয় (খাস) হিসেবে বাস্তবায়ন করতেন।

সাহাবা কিরামের অনুসৃত নীতি যা তাঁরা সাধারণত ব্যবহার করতেন, সে ধরনের বিষয়কে তিনি একই ধরনের বিষয়ে তিনি দলীল আকারে ব্যবহার করতেন।[৭]

একাধিক বর্ণনাকে কখনও মূল দলীলের উপরে প্রাধান্য দেয়া হতো না।

এমন বিষয়কে বিবেচনা করা হতো না, যা পূর্বেই যোগ্যতা ও গুনাবলীর দিক থেকে গৃহীত আকারে মর্যাদা লাভ করেছে।

এমন কোন নীতি গ্রহণ করা হতো যা খবরে ওয়াহিদ শ্রেণীভুক্ত। যদি তা সনাতনী রীতিতে জনকল্যাণে নিবেদিত হউক।

অবশ্যই করণীয় বিষয়কে গ্রহণ করতেন যদিও এখানে প্রতিরোধক কোন নীতি আবর্তিত হতো।

যদি কোন ফিকহবিদ তার উদ্ধৃতির বিরুদ্ধে মতামত দিতেন,তিনি বিরোধী মতামত গ্রহণ করতেন। এক্ষেত্রে যা মতামত দেয়া হয়েছে তার প্রতিগুরুত্ব দিতেন, বর্ণনার প্রতি নয়।

পরিষ্কার কোন কিয়াসকে তিনি প্রাধান্য দিতেন যেখানে খবরে ওয়াহেদ দ্বারা কোন দলীল দেয়া হতো।

অগ্রগণ্য সিদ্ধান্ত (ইসতিহসান) হিসেবে কিয়াসকে বাদ দিতেন, যখন কোন প্রয়োজনীয় অবস্থার উদ্ভব হতো।

এই কারণে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, আমরা জানি যে, এটি একটি সিদ্ধান্ত এর ওপর আমরা তাকে উত্তম মনে করি যার উপর আমরা সক্ষমতা প্রদর্শন করি। তবুও যদি আমরা এক্ষেত্রে কোন ভাল মতামত পেয়ে যাই আমরা তা গ্রহণ করি।

ইমাম মালিক (রহঃ) এর পদ্ধতি

ইমাম মালেক (রহঃ) তার পদ্ধতি সমূহে বিভিন্ন নিয়ম ব্যবহার করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি নিজেই বর্ণনা করেন, এছাড়া কি ব্যবস্থা হতে পারে যেখানে

www.pathagar.com

কোন ব্যক্তি আমাদের কাছে কোন বিষয় জানতে আসল, আমরা জিব্রাইল (আঃ) মুহাম্মদ (সাঃ) এর নিকট কি নিয়ে এসেছে তার বাইরে আমরা যাব ।[৮]

ইতিপূর্বে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি, ইমাম মালিক (রহঃ) এর নীতি তাই ছিল যা হিজাজের লোকদের নিকট গৃহীত নীতিমালা ছিল । তিনি ছিলেন সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব এর উত্তরসূরী । ইমাম মালিকের মাযহাবের সার সংক্ষেপ নিম্নরূপভাবে বলা যায় :

কুরআনুল কারীমকে 'নাস' হিসেবে গ্রহণ করা ।

অতঃপর স্পষ্ট অর্থবোধক অথবা সাধারন অর্থবোধক হিসেবে গ্রহণ করা ।

অতঃপর তার দলীলকে দ্বিত্বার্থক হিসেবে ব্যবহারকরণ, যাতে বিরোধী অর্থ বুঝা যেতে পারে ।[৯]

কুরআনের কোন সতর্কতার বিপরীতে অন্য যেকোন দলীলকে বাদ দিতেন, যা মূলক অনৈতিকতা হিসেবে বিবেচিত হতো । কেননা কুরআনে এবিষয়ে বলা হয়েছে- 'নিশ্চয়ই তা একটি দুষণীয় কাজ অথবা একটি ফাসেকী কাজ' (৬ ঃ ১৪৫) ।

কুরআন সংশ্লিষ্ট এই পাঁচটি মূলনীতির সাথে সাথে সুন্নাহর সাথে সংশ্লিষ্ট আরও ১০টি নীতিমালাও রয়েছে যেগুলো হচ্ছে –

১. ইজমা, ২. কিয়াস, ৩. মদীনার লোকদের রীতি ও নীতি, ৪. ইসতিহসান নীতি যা কোন কিয়াসকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতো, ৫. গুণাহ সম্পর্কিত বিষয় হতে পারে এমন বিষয়কে আদেশে গণ্য না করা, ৬. সাধারণের স্বার্থের বিবেচনা করা (আল মাসালিহুল মারসালাহ), ৭. সাহাবীগণের বক্তব্য- যদি তা সূত্র মতে হয় এবং তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করে থাকেন, ৮. বিরুদ্ধাচরণকে গ্রহণ করা যদি তা শক্তিশালী হয়, ৯. পূর্ববৎ প্রচলিত বিষয়কে গ্রহণ করা যা প্রমাণিত হিসেবে বলবৎ রয়েছে এবং এর আগের অন্য কোন মত পাওয়া না যায়, ১০. ইসলামের পূর্বের (প্রথা হিসেবে প্রচলিত) কতিপয় আইনকে গ্রহণ করা ।

ইমাম শাফি (রহঃ) এর কর্ম পদ্ধতি

ইমাম শাফিঈ (রহঃ) এর মাযহাবের নীতিমালা তিনি তার রিসালাহ নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন । তাতে তিনি কিতাবুল্লাহকে সর্বপ্রথম বিবেচনা করে তাঁর অসুল ফিকহ বা ইসলামী বিধি-বিধানের নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন ।

www.pathagar.com

ইমাম শাফিই (রহঃ) তার গ্রন্থে বর্ণনা করেন- কুরআন ও সুন্নাহ হচ্ছে মূল। তা যদি না হয় অর্থাৎ না পাওয়া যায় তাহলে এ দুয়ের সাথে কিয়াস করতে হবে। যদি রাসূল (সাঃ) থেকে কোন হাদীস পাওয়া যায় আর তার সনদ বিশুদ্ধ হয় তাহলে সেখানে অন্য কোন অবলম্বন গ্রহণ করা যাবে না। একজনের বর্ণনা মতে হাদীসের চেয়ে ইজমা বড়। কোন হাদীস প্রকাশ্য যে অর্থবোধক হবে তাহলে সন্দেহমূলক কোন অর্থদ্বারা তার উপর প্রাধান্য দেয়া যাবে না যদি তা উত্তমও হয়। যদি কোন হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে তার সনদ উত্তম হতে হবে। ইবনুল মুসাইয়্যাব দ্বারা কর্তিত কোন হাদীস ছাড়া কোন কর্তিত সনদের হাদীসকে প্রকাশ্য দেয়া যাবে না। কোন আসল বা মূল নীতিকে আরেকটি মূলনীতির সাথে তুলনা করা যাবেনা যা ইতো পূর্বে মূল দলীল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কোন মূলের ব্যাপারে কিভাবে ও কেন বলা যাবেনা। তবে 'কেন' প্রশ্ন কেবল মাত্র কোন উপশাখার ব্যাপারে করা যাবে। এমতাবস্থায় যখন কিয়াস বিশুদ্ধ হবে মূলনীতির আলোকে,তাতে গ্রহণযোগ্য দলীল হিসেবে তা বিবেচিত হবে। [১০]

ইমাম শাফিঈ (রহঃ) বিবেচনা করেছেন যে, ক্ষেত্র বিশেষে বিধানদাতা হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহ সমান। সেজন্য কোন হাদীসের উপর সনদ ও মতনের বিশুদ্ধতা ব্যতিত কোন শর্তারোপ করা যাবে না। যখন তা মূল হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। মূলনীতিতে যখন তাকে কেন ও কিভাবে বলা হলো না তাহলে তার জন্য হাদীস মাশহুর হওয়ার শর্তারোপ করা যাবে না। [১১]

যখন কোন বিষয়ের সমাধান সাধারনের চাহিদার আলোকে দেখা দিল যেমনি ইমাম আবু হানিফা মদীনার অধিবাসীদের আমলের মধ্যে বিরোধীতা করার বিষয়টি শর্তারোপ করা যায়নি। যেমনি মালেক (রহঃ) শর্তারোপ করেছেন। কিন্তু সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যাব এর হাদীস ছাড়া অন্য মুরসাল হাদীসকে তিনি গ্রহণ করেননি। কেননা তার নিকট এটি একটি সংযুক্তির পন্থা হিসেবে গৃহিত। এ প্রসঙ্গে মালিক (রহঃ) সুফিয়ান সাওরী ও তাদের অনুসারীরা এর বিরোধীতা করেছেন। আহলে হাদীস যারা হাদীসের কাছে নিজেদের একমাত্র অবলম্বন মনে করেন, তারা হাদীস মুরসালকে গ্রহণ করার পক্ষপাতি; মালেকী, হানাফী, শাফিঈ ইসতিহসানকে শরীয়াতের মৌলিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন না। এই প্রেক্ষিতে তারা একটি বই রচনা করেন যার নাম ইবতাল আল ইসতিহসান। যেখানে তাঁর প্রসিদ্ধ উদ্ধৃতি স্থান পেয়েছে। বলা হয়েছে- এই ধরনের

www.pathagar.com

অগ্রগণ্যতা এক পর্যায়ে আইন প্রণেতা হিসেবে স্বীকৃত হয়ে যায় যা গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া তারা আল মাসলিহ্ আল মুরসালাহকে বাতিল মনে করেন। তারা কিয়ামের গ্রহণযোগ্যতাকেও অস্বীকার করেন যা অপ্রকাশ্য দলীল হতে পারে না। মদীনার অধিবাসীদের কোন কাজকেও তারা দালিলীক কারণে (ইল্লাত) গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। একই ভাবে তারা হানাফীগণের অধিকহারে সুন্নাহর আমল বাদ দেয়ার বিরোধীতা করেন। যেক্ষেত্রে হানাফীগণ প্রসিদ্ধ কোন হাদীসের শর্তাবলীকে গ্রহণ করেন না তা তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। সর্বশেষ তারা মালিকীদের হিজাজবাসীদের হাদীস গ্রহণেরও বিরোধীতাকারী। উপরোক্ত নীতিমালা হচ্ছে শাফেয়ী মাযহাবের নীতিমালার গুরুত্বপূর্ণ দিক। সেখানে হানাফী ও মালেকী মাযহাবের সঙ্গে বিরোধীতা রয়েছে যা গোপন নয়।

আহমদ ইবনে হাম্বলের মাযহাবের নীতিমালা

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) নীতিমালা অনেকটা ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর কাছাকাছি। এবিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর গৃহিত নীতির মধ্যে রয়েছে–

প্রথমতঃ কুরআন ও হাদীসকে 'নাস' হিসেবে গ্রহণ করা। যদি এতদুভয়ে সমাধান পাওয়া যায় অন্যদিকে দৃষ্টি না দেয়া। সহীহ হাদীসের বিপরীতে কোন অবস্থায় আহলে মাদানী বা রায় বা কিয়াসকে প্রাধান্য না দেয়া অথবা এমন ইজমা যার বিরুদ্ধাচরণকারীদের সম্পর্কে অনভহিত।

দ্বিতীয়তঃ যদি এই নামগুলোতে মাসআলার সমাধান না পাওয়া যায়,তাহলে সাহাবীগণের ফাতওয়ার দ্বারস্থ হওয়া। যদি সাহাবীর বক্তব্য পাওয়া যায়, অন্যকোন সাহাবীর বিরোধীতা না পাওয়া যায়, তাহলে তিনি কোন আমল, রায় বা কিয়াস প্রাধান্য দেয়ার পক্ষপাতি নন।

তৃতীয়তঃ যদি সাহাবীগণের মধ্যে কোন বিষয়ে মতপার্থক্য পাওয়া যায় তিনি সেই মতটিকে গ্রহণ করেন,যা কুরআন ও সুন্নাহর নিকটবর্তী। যদি কুরআন ও হাদীসের নিকটবর্তী সিদ্ধান্ত পাওয়া না যায় তাহলে তিনি সিদ্ধান্ত প্রদানে বিরত থাকেন।

চতুর্থতঃ তিনি হাদীসে মুরসাল ও দায়ীফকে গ্রহন করতেন। যদি এর বিরুদ্ধে অন্য অধ্যায়ে কোন বিরোধীতা না থাকে। অথবা কোন সাহাবীর বিরোধীতা বক্তব্য না থাকে অথবা কোন ইজমা, তিনি তাকে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দেন।

www.pathagar.com

পঞ্চমতঃ কিয়াস আইন প্রনয়ণের জন্য কেবলমাত্র তখনি দলীল বা উৎস হতে পারে যদি অগ্রগন্য অন্য কোন দলীল এখানে পাওয়া না যায়।
ষষ্ঠতঃ তিনি সাদ আল দারী[১২] ভুল ও ত্রুটির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত স্থগিত নীতিমালা গ্রহণ করেন।

ইমাম দাউদ জাহেরী (রহঃ) নীতিমালা

ইমাম দাউদ জাহেরী (রহঃ) এর মাযহাবের নীতিমালা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণদেয়া প্রয়োজন। কেননা তার নীতিমালা অনুযায়ী একটি গ্রুপ অনুযায়ী হয়েছেন যারা সুন্নাহর উত্তরসূরী। এ মাযহাবের সবচাইতে বেশী মতানৈক্য হয়েছে হানাফী মাযহাবের সাথে, মালিক, শাফী ও আহমদ ইবনে হাম্বলের মাযহাবের সাথে। তবে আল জাহেরী শাফিয়ী মাযহাবকে অধিকতর অনুমোদন দিয়েছেন। ইমাম জাহেরীর মাযহাবের মূল নীতিমালা হচ্ছে কুরআনুল কারীম ও সুন্নাহর প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করা। এর বিকল্প অর্থ রায়, বা জনগনের স্বার্থকে এর বিবেচনার কোন সুযোগকে তিনি প্রাধান্য দেননা। তিনি কিয়াসের উপর আমল করেন না। তার মাযহাবের অনুসারীদের মতে,পূর্ববর্তী ঘটনা যার উপর কিয়াস[১৩] করা হয়,তা খন্ডিত ও কর্তিত আকারের হয় যার জন্য কিয়াস করা হয় তা নাযিলকৃত কোন হুকুমের জন্য সাদৃশ্য হয়ে থাকে। (আল মানাত বিশ্লেষণের মাধ্যমে)।[১৪]

তারা ইসতিহসানকে নিষিদ্ধ গণ্য করেন। তারা ইজমাউস সাহাবীকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন। মুরসাল ও মুনকাতি হাদীসের উপর তারা আমল করেন না। এটা মালেকী হানাফী ও হানাবেলাদের বিরোধী। তারা কুরআন পূর্ববর্তী কোন বিধান গ্রহণ করেন না। তারা কোন রায়কে সমর্থন করেন না। কেননা আল্লাহর বাণী– 'আমি কুরআনে সব বিষয়ে সবিস্তারে বর্ণনা করেছি।' (আনআম-৩৮) এই ভিত্তিতে তাদের মতামত হচ্ছে, আল্লাহর নির্দেশের সীমার বাইরে কোন বিধান গ্রহণযোগ্য নয়। তারা মনে করেন, প্রত্যেক বালেগ মুসলমানের দায়িত্ব রয়েছে প্রত্যেক বিষয়ে ইজতিহাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া। তাকলীদকে তারা হারাম মনে করে সাধারণের জন্য এবং আলিমের জন্য।

www.pathagar.com

আমাদের বক্তব্য

এ কথা সত্য আমাদের বলতে হয় যে, অনেকগুলো নীতিমালা স্ব-স্ব ইমাম ও অনুসারীগণের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। তারা কেউ স্বীকৃত কোন নীতিমালাকে উপেক্ষা করেননি। তারা ভিত্তিহীন কোন নীতিমালা জারী করেননি। তারা কোন সমালোচনা ও বিরোধীতাকে চ্যালেঞ্জ করেননি। যত মত পার্থক্য হয়েছে তা কুরআন ও সুন্নাহকে ঘিরেই সংঘটিত হয়েছে। তাদের মতপার্থক্যের একটি অন্যতম আদর্শ ছিল যে, তারা নিজেদের টিকে একমাত্র মনে করেননি। কিন্তু আজকের দিনের মুসলমানদের মতপার্থক্য হয় বড় ও প্রাধান্য বিস্তার নিয়ে। ক্ষুদ্র বস্তুকে তারা বড় বস্তুতে পরিণত করে। এই হিসাবে বলা যায়- আজকের মুসলমানদের জ্ঞানের সংকীর্ণতা তাদেরকে এ পর্যায়ে নামিয়ে ফেলেছে।

---

১. ইয়াহইয়া ইবনে সাদ, মৃত্যু - ১৯৮হিজরী তিনি ইমাম মালিকের অনুসারী ছিলেন। তিনি একজন মর্যাদাবান হাদীস বিশারদ ছিলেন। এ বিষয়ে তার জানাশোনা ছিল ব্যাপক। তিনি ইমাম আবু হানিফা কর্তৃক বিচার কাজের নমুনায় বিচার ফয়সালা গ্রহণের প্রবক্তা ছিলেন।

২. *হিশাম ইবনে উরওয়া*, মৃত্যু ঃ ১৪৫ হিজরী। তিনি একজন তাবেয়ী ছিলেন। তার সময়কালে মদীনার প্রসিদ্ধ ইমাম হিসাবে পরিগণিত ছিলেন। তিনি বহু হাদীসের হাফিজ ছিলেন। একজন সুফিকহবিদ ছিলেন।

৩. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক মদীনার অধিবাসী ছিলেন। পরে ইরাকে স্থানান্তরিত হন। সেখানে তিনি ১৫১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি একজন যুদ্ধ বিশারদ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

৪. *ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহিম* ঃ (মৃত্যু ১৮২ হিজরী) বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন, আবু হানিফার শীর্ষস্থানীয় ছাত্র ছিলেন। অগ্রবর্তী অনুসারীগণেরও একজন ছিলেন। তিনি বিচারক ছিলেন। তার অনেক গ্রন্থাবলীর মধ্যে তারিখে বাগদাদ, তাজকেরাহ, জারাহ ওয়াত তাদীল, তাবাকাত ইবনে সাদ, জাওয়াহেরুল মাজীয়াহ উল্লেখযোগ্য।

৫. *মুহাম্মদ ইবনুল হাসান* ঃ (মৃত্যু- ১৮৯ হিজরী) ইমাম আবু হানীফার অনুসারী ও সহকর্মী ছিলেন। বাদশাহ হারুনুর রশীদ তাকে বিচারক নিয়োগ করেন।

www.pathagar.com

৬. *আল আম* ঃ এটি এমন একটি শব্দ যা দ্বারা ব্যাপক অর্থ বুঝায়। আরবী ভাষায় কুল্লু বা জামি বা এ জাতীয় শব্দের অর্থের মত এর পরিধিকে এর অর্থে ব্যবহার করা হয়।

আল খাস ঃ যা নির্দিষ্ট অর্থ জানার জন্য সহায়তা করে।

আল কাতয়ী ঃ যা কর্তিত বা অকাট্য এর অর্থ প্রদান করে। এটি এমন একটি দলীল যা অকাট্য কোন বিষয়কে নির্ধারিত করে দেয়। যেমনটি কুরআনুল কারীমের কোন প্রকাশ্য আয়াত দ্বারা নির্ধারিত হয়। আর এর দ্বারা কোন নির্দিষ্ট আদেশ নির্ধারিত হয় যা একেবারেই বিশুদ্ধ। একে প্রকারান্তরে একমাত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কুরআনের আয়াত ও মুতাওয়াতির হাদীসের দ্বারা দলীল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ক্ষেত্রবিশেষে এর দ্বারা অনির্ধারিত (জান্নী) বা অস্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

৭. এর জন্য আরও দেখুন, Islamic juris prudance, P-131-43.

৮. আল ফিকরুস সামী ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৭৪।

৯. Hasim kamaliq Islamic juris prudance, P- 166-74.

১০. আল মিনহাজ লিন নাবুবী ওয়াল ফিকরুস সামী ১ম খন্ড, পৃঃ- ৩৯৮।

১১. *হাদীসে মাশহুর* ঃ হাদীসে মাশহুর হচ্ছে বর্ণনাকারীগণের মধ্যে প্রত্যেক স্তরে এক বা একাধিক বর্ণনাকারী প্রত্যেক স্তরে থাকেন যাদের সবশেষ একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী থাকেন। নোজহাতুল নাজার ফি নাখবাতুল ফিখর তাবয়ুলী জামিআতুল সালাফিয়া।

১২. *আল সাদ আল যারায়ী* ঃ শাব্দিকভাবে এমন অবলম্বন যাতে অন্য কোন দিকে নিয়ে যায়। চাই তার সমকক্ষ হউক বা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য হউক ভাল বা মন্দ হউক। পরিভাষায় কোন নিষিদ্ধ বিষয়ের দিকে পৌছানো যা তার জন্য হারাম। এ দৃষ্টিটি তাকে যিনার দিকে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম। সুতারাং এ দৃষ্টিটি হারাম হওয়াকে সাদ আল যারায়ী হিসেবে বিবেচিত হয়। (ইলামুল মুকিয়ীন, ওয়াল মুদখাল, অসুলু মাযহাবে ইমাম আহমদ)।

১৩. *কিয়াস* ঃ এতদসংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যতা স্থাপন করা আর কিয়াস দ্বারা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

১৪. *মানাত* ঃ এটি জানা বা বুঝার একটি মাধ্যম যা হুকুমের কারণ বা উৎস। গবেষক তার গবেষণা দ্বারা এর কারণ নির্ণয় করেন। মানাতকে এজন্য কারণ বলা হয় যে, কেননা বিধানটি এর মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

মতানৈক্যের কারণ ও এর পরিধি

নবুয়তের যুগে মতানৈক্য ঃ

আমরা এটা লক্ষ্য করলে দেখি যে, মতানৈক্য গুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে একটি চিন্তাশীলতার মাধ্যমে, এগুলো ছিল ফিকহী সিদ্ধান্ত বিষয়ে। এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে সময়কার মানুষ গুলো তাদের জ্ঞান, বিবেক ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, রাসূলের সময়কালে ও খোলাফায়ে রাশেদার সময়কালে অনেক সাহাবীর মধ্যে নানা বিষয়ে মতপার্থক্য হয়েছে। যেগুলো ছিল কতিপয় ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে। এমন বিষয়ে ছিল যা দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে অবদান রাখার বাধার সৃষ্টি করে। দ্বীনি দাওয়াতের বিরোধী দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী বিষয়ে মতপার্থক্য হয়নি। যারা মতানৈক্য করেছেন তাদের নিয়তের মধ্যে সত্য ও ন্যায়ের কোন কমতি ছিল না। এ প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি যে, এসব মতানৈক্য শিক্ষা গ্রহণের অনেক সুযোগ রয়েছে যা দ্বীনকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তারা মতপার্থক্যে এ কথা বিবেচনায় নিয়েছিলেন যে, তারা সকলেই মানুষ। তারা অনেক বিষয়ে মতপার্থক্য করলেও দ্বানে দুর্বলতা আসতে পারে বা তাদের অবস্থা বিশ্বাসে ঘাটতি হতে পারে এমন বিষয়ের তারা উদ্ভব করেননি। বরং তাদের মতানৈক্য দ্বারা দ্বানের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস এবং দ্বানের বিদ্রোহীদের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার সৃষ্টি করেছে। রাসূল (সাঃ) যখন হুকুম আহকামের জন্য তাদের মধ্যমনি হিসেবে বিদ্যমান ছিলেন তখন মতানৈক্য বড় আকার ধারণ করেনি। তখন কোন বিষয়ের ইখতিলাফকে তাঁর নিকট সমাধানের জন্য নিয়ে যাওয়া হতো। বিধি-বিধানের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যেসব মতপার্থক্য হয়েছিল তা কুরআন ও সুন্নাহকে ঘিরেই হয়েছিল। গবেষণাগত ও শাব্দিক অর্থের মত পার্থক্য দ্বারা হয়েছিল। তখনকার দিনে মুনাফিক সমাজকে সুযোগ তৈরী করে দিতে পারে এমন একটি পার্থক্য তাদের মধ্যে হয়নি। মত পার্থক্যের এই অবস্থায় রাসূলের সামনে উত্থাপিত

www.pathagar.com

হলে তা সাথে সাথেই শেষ হয়ে যেত। একপক্ষের জন্য সম্মতি হলে অন্যপক্ষ তা নীরবে মেনে যেত। কেননা উভয় পক্ষ সত্য উদঘাটনের জন্য ব্যস্ত থাকত এবং রাসূলকে সত্যের মাপকাঠি মনে করতেন।

এই সাধারণ মতপার্থক্য রাসূলের পরবর্তী সময়ে হয়েছে তা কোন ব্যাপক আকার ধারণ করেনি, বরং একই অবস্থায়ই বিদ্যমান ছিল। ইসলামের ছায়াতলে নিজেদের রেখেই তারা সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজেছেন। ফলে মত পার্থক্যের যে অবস্থা তাদের মধ্যে ছিল তা একটি সুক্ষ্ম পবিত্রতা বিদ্যমান ছিল।

হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) এর শাহাদাতের পর পূর্ববৎ চলমান সাধারণ মতপার্থক্য ভিন্নমাত্রা লাভ করে এবং ইসলামের মধ্যে একটি সংঘাতমূলক অবস্থার জন্ম দেয়। সে সাথে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা চরম আকারে পৌঁছে। এ অবস্থায় প্রত্যেক এলাকা ও প্রদেশের লোকেরা নিজেদেরকে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতের প্রতিরোধকারী হিসেবে বিবেচনা করতে থাকে এবং নিজেরা এক ধরনের ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে দিনাতিপাত করে যা ইতিপূর্বে সংঘটিত হতে দেখেছে।

এই প্রেক্ষাপটে বসরা ও কুফায় জ্ঞানচর্চার মূল কেন্দ্র হিসেবে প্রকাশিত হয়। রাজনৈতিক চিন্তার বিভক্তির মাধ্যমে অনেক দল উপদল ও মত পথের জন্ম দেয়। যেমন খারেজী, শিয়া, জাহমিয়া ও মুরজিয়া। উদ্ভব হয় মুতাযিলাহ আরও অনেক নব আবিষ্কার পূর্ণ দলও বিদআত। তাদের মধ্যে বিধি-বিধানের উৎস, সিদ্ধান্ত ফিকহী চিন্তা চেতনা ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য তৈরী হয়। ফলে বৈধ ও অবৈধ প্রক্রিয়ার মতপার্থক্য তারা প্রচলন করে।

আল্লাহ তায়ালার অপার মেহেরবাণী এসব ইখতেলাফ ফিকহী বিষয়ে অধিকন্তু হওয়ায় তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর চর্চা বেশী মাত্রায় করতে হয়েছে। তাদের এই মত পার্থক্য শরীয়াতের গন্ডির মধ্যে হওয়ায় দুটি অবস্থা লক্ষ্য করা যায়–

এক. মত পার্থক্যকারীগণ সকলেই সঠিক বিষয়ের মুখাপেক্ষী ছিল। যদি দলীল পাওয়া না যেত তাহলে চুপ করে যেত নিজেদেরকে একমাত্র সঠিক মনে করত না।

দুই. বিরোধী মাযহাবকে বাতিল বলে সাব্যস্ত করেনি। যদি তা প্রথম দিক থেকে মত প্রদানের স্বাধীনতা হতো তাহলে বিরোধীতা ও মতপার্থক্য নামক এভাবে চলতে পারতো না।

www.pathagar.com

উপরের আলোচনায় মতপার্থক্য যে দুটি শর্ত বর্ণনা করা হলো, সেখানে জ্ঞান ও গবেষণার দৃষ্টি ভঙ্গি ফুটে উঠেছে। তাদেরকে এসব উপায় ও উপকরণের মাধ্যমে সফল করে তুলেছে। আর বিরোধীতা করার অপর যে শর্তটি আলোচিত হলো, তা নিজেদের খেয়ালখুশি ও অনুমান ভিত্তিক ছিল বিধায় তাতে বিষয়ের সফলতার জন্য সম্পর্কযুক্ত বলে বিবেচনা করা যায় না।

ফুকাহাদের সময়কালে মতপার্থক্যের কারণ সমূহ

সকল ফিকহবিদগণ নিজেদের মাযহাবের প্রতি উম্মতকে সংঘবদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করেছেন। পূর্বে উল্লেখিত ইখতিলাফের শর্তাবলীর প্রয়োগের মাধ্যমে তা পরিচালনা করা হয়েছে। আর এ সময়ের মতপার্থক্যকারীগণ তাদের মতপার্থক্যের সীমাতে স্পষ্টতা আনয়ন করেন। মতপার্থক্যের এসব কারণগুলো তাদের সামনে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। এই কারণে মতপার্থক্যের কারণগুলো নিম্নবর্ণিত কারণের আওতায় ছিল :

১. শাব্দিক অর্থগত কারণ :

ফিকহবিদগনের পরিভাষায় দ্বিত্ব অর্থবোধক শব্দাবলী যা একাধিক অর্থ প্রদানের জন্য উপযুক্ত। যেমন 'আইন' শব্দটি দৃষ্টি অর্থে আবার প্রবাহমান পানি অথবা নিখুঁত স্বর্ণ অথবা গোপন পাহারাদার ইত্যাদি অর্থের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। এখন এসব অর্থকে শরীয়াহ বিশেষজ্ঞগণ 'কারীনা' বা উপসর্গ হিসেবে স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিবেচনা করেন। তারা একে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সম্পর্কযুক্ত অর্থকে বিবেচনা করেন। ফলে ফিকহবিদগণের মধ্যে কোন অর্থটি প্রযোজ্য হবে বা গ্রহণ করা হবে বা প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত এ নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। উদাহরণ স্বরূপ 'আল কুরউ' শব্দটি আল্লাহর বাণীতে এসেছে–

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

অর্থ : তালাক প্রাপ্ত মহিলারা যেন তিনটি ঋতু পর্যন্ত নিজেদের পৃথক করে রাখে। (বাকারা:২২৮)

এখন এখানে কুরুউন শব্দটি তিন তুহুর বা তিন হায়েজ দুটি অর্থ গ্রহনের জন্য সুযোগ থাকায় ফিকহবিদগণ মতানৈক্য করেছেন কি তিন তুহুর বা তিন হায়েজ অর্থ গ্রহণ করা হবে। হিজাজীগণ তিন তহুর গ্রহণের পক্ষে আর ইরাকীগণ তিন হায়েজ গ্রহণের পক্ষে চলে যান।

www.pathagar.com

এখানে শাব্দিক অর্থকে দুটি বিবেচনায় নেন: (হাকিকী) সরাসরি ও (মিজাযী) রূপার্থক। সেখানে কোন অর্থ নেয়া হবে তা নিয়ে মত পার্থক্য দেখা দেয়। অনেক ফিকহবিদ রূপার্থককে বিধান নির্ধারণের জন্য গ্রহণ করেছেন। কমসংখ্যক এর বিরোধীতা করেছেন। আবু ইসহাক আসফারাইনী এবং ইবনে তাইমিয়া যাদের মধ্যে অন্যতম।

যারা রূপক অর্থের বিরোধীতা করেছেন তারা বলেন যে, শরয়ী বিধান নির্ধারণের এ ধরনের অর্থ গ্রহণের সুযোগ নেই। যেমন 'আসাদুন' শব্দটির অর্থ সাহসী মানুষ অর্থ হতে পারে। কিন্তু তা শরয়ী বিধানের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

এছাড়া ফিকহবিদগণ কোন শব্দের নির্দেশক অর্থ (মুরাদ) নির্নয়ে ও মতপার্থক্য করেছেন। যেমন 'মিজান' শব্দটির সরাসরি অর্থ হচ্ছে কোন বস্তুর মাপক যন্ত্র। কিন্তু মেজাজী বা রূপক অর্থে ন্যায় বিচার অর্থে একে ব্যবহার করার সুযোগ থাকে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী –

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۞ أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

অর্থঃ আসমান তাকে সুউচ্চ করে রেখেছেন এবং তিনি মহাশূন্যে মানদন্ড স্থাপন করেছেন। যাতে করে কখনো তোমরা ন্যায়বিচারের সীমা লংঘন না করো। ইনসাফ মোতাবেক মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করো। মানদন্ডের কোন ক্ষতি করো না। (আর রহমান ৭-৯)

এখানে মীজান শব্দটির সরাসরি অর্থের সাথে ন্যায় বিচারের ব্যবহার রয়েছে। যেমন অন্যত্র কুরআনে রয়েছে–

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

অর্থ : আমরা আমাদের রাসূলকে সত্য প্রমাণ সহকারে প্রেরণ করেছি। তাকে কিতাব দিয়েছি এবং মানদন্ড দিয়েছে যেন তারা মানুষদের ন্যায়পরায়ণতার ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। (৫৭:২৫)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে উপরের দুটি পদ্ধতির বাইরে তৃতীয় পদ্ধতি শব্দের অনভূতি ও উপলব্ধিমূলক অর্থ থেকে থাকে। যেমন বলা হয় বস্তুর ওজন দেয়ার

www.pathagar.com

মানদন্ড, আবার বলা হয় কথা বা বাক্য ওজন করার মানদন্ড। এছাড়া রূপক অর্থের আরো উদাহরণ কুরআনে রয়েছে। যেমন:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى •

অর্থ : হে আদম সন্তানরা, আমি তোমাদের ওপর পোষাক সংক্রান্ত বিধান পাঠিয়েছি যাতে করে তোমরা তোমাদের গোপন অঙ্গ ঢেকে রাখতে পারো এবং সৌন্দর্য ফুটায়ে তুলতে পারো। (আরাফ-২৬)

এখানে বুঝবার বিষয় হচ্ছে আকাশ থেকে পোষাক প্রেরণ করা যায় না বরং পোষাকের বিধান প্রেরণ করা যায়। আয়াতে যে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে সৌন্দর্যের বিষয়টি ও অনুরূপ। এখানে আয়াতের অর্থ নিশ্চয়ই রূপক ও উপলব্ধিমূলকভাবেই গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং কারণকে উদ্দেশ্যর জন্য পরিবর্তনের মাধ্যমে বিধান নির্দেশক হিসেবে চিহ্নিত করা জরুরী।

এটা জানা কথা যে, তুমি কর বাক্যটি নির্দেশক এবং করো না বাক্যটি নিষেধবাচক। এখানে মূখ্য বিষয় হচ্ছে নির্দেশক অবশ্যই পালনের জন্য অর্থ প্রদান করে আর নিষেধ হারাম হওয়ার জন্য। এখানে সরাসরি অর্থ দ্বারা ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু অবস্থার আলোকে ভিন্নার্থক ভাবে একে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় যা পূর্বের অর্থের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ন নয়।

কখনও কখনও সতর্কতা ও নির্দেশ পৌছে দেয়ার জন্য বাক্য ব্যবহার হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

অর্থ ঃ তোমাদের অধিকারভুক্ত কোন দাস-দাসীদের ভেতর যারা চুক্তি লিখিয়ে নিতে চায় তোমরা তা লিখে দাও, যদি তাদের জন্য কল্যানকর মনে কর। (নুর: ৩৩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

অর্থ : তোমরা যখন পরস্পরের সাথে নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য ঋণের চুক্তি করো তখন তা লিখে রাখো। (বাকারা : ২৮২)

www.pathagar.com

আবার যারা রাসূল (সাঃ) এর বাণীকে উপেক্ষা করে তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হয়েছে–

فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ

অর্থ : তোমাদের ইচ্ছা যেমন তেমনি করে যাও। (৪১ঃ৫)[১]
এ ছাড়া আরো অন্যান্য অর্থেও ব্যবহার করার প্রমাণ রয়েছে। এমনিভাবে নিষেধসূচক বাক্য নিষিদ্ধকরণ ছাড়া অন্যান্য অর্থেও ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- মাকরূহ বা ঘৃণা অর্থে। যেমন আল্লাহ্ তায়ালার বাণী–
অর্থ : আমি এ কাফিরদের মাঝে কিছু লোককে ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি তুমি কখনও চোখ তুলে তাকাবে না। (হিজর : ৮৮)
অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ-

لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

অর্থ : এমন সব বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করো না, যার জবাব প্রকাশ করা হলে তোমাদেরই কষ্ট হবে। (মায়েদাহ : ১০১)
একই নির্দেশসূচক (আমর) বর্ণনার (খবর) অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার নিষেধ (নাহী) বর্ণনা ও বারণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এসব অর্থগুলো ফিকহবিদগণের মতানৈক্য ভূমিকা রেখেছে। আর তারা নিজস্ব পদ্ধতিতে এসব অর্থকে আহকামে শরীয়ায় প্রয়োগ করেছেন। মাযহাবের বিভিন্নতায় ফিকহবিদ ও উলামাগণ গৃহিত অর্থকে নাম বা দলীল হিসেবে বিবেচনা করেছেন। বাক্যের ব্যকরণ গত ব্যবহার নিয়েও তারা মতপার্থক্য করেছেন। যেমন আল্লাহর বাণী–

وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ

অর্থ : লেখক ও সাক্ষীদের কখনও কষ্ট দেওয়া যাবে না। (বাকারা-২৮২)
এই আয়াতের অর্থ নিয়ে ফকীহগণ ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসুদ (রাঃ) এর কিরাতের উপর আমল করেন। ফলে এক পক্ষের কাছে কর্মবাচ্য ও অন্য পক্ষের নিকট তা কর্তৃবাচ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।[২]
ইখতিলাফের কারণসমূহের মধ্যে এসব অর্থের সমর্থনকে বর্ণনা করা যায়। এধরনের অনেক উদাহরণ উপমা পাওয়া যায়। শব্দের গঠন ও বাক্য নিয়েও মতানৈক্য পাওয়া যায়। যেমনিভাবে আম, খাস বর্ণনা (বয়ান) ইজমাল একত্রীকরণ ইত্যাদি অর্থের ব্যবহার দেখা যায়। আমরা এখানে এ বিষয়ে যা বললাম, তাতে নিশ্চয়ই আমাদের অলসতাকে দূর করতে সহায়ক হবে এবং আরও জানতে উৎসাহ যোগাবে।[৩]

www.pathagar.com

২. হাদীস বর্ণনার কারণে মতানৈক্য :

মতানৈক্যের কারণ সমূহের এই প্রকার বিভিন্ন দিক থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার ও প্রকৃতির সাহাবীগণের কার্যক্রম ফকীহগণ বড় বড় ইস্যুতে মতানৈক্য করেছেন। যা সলফে ছালেহীনগণের সময়কালে পরিলক্ষিত হয়েছে। যদি কোন বিষয়ে গবেষকগণের নিকট কোন হাদীস না পাওয়া যেত,তখন তারা প্রকাশ্য কুরআনের দ্বারা অথবা অন্য হাদীস দ্বারা ফতওয়া দিতেন। অথবা মাসআলাকে অন্য মাসআলার সাথে কিয়াস করে সমাধান দিতেন যা রাসূল (সাঃ) সময়কালে সংঘটিত হয়েছে। অথবা পূর্ববর্তী প্রচলিত নিয়মকে বহাল রাখতেন। ইছতিছহাবুল হাল পদ্ধতির আলোকে।[৪] যদি এমন হাদীস সামনে এসেছে যা একটি বিতর্কিত ঘটনার প্রমাণসহ অন্য হাদীস তা প্রমাণ করে তাহলে অবস্থার আলোকে গবেষক ফতওয়া দিয়েছেন তখন স্বাভাবিকভাবে সেখানে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে।

গবেষকের নিকট কোন হাদীস সামনে আসার পর দেখা গেল সে হাদীসের উপর আমল না করার জন্য কোন ইল্লত পাওয়া যায়। যেমন সনদের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে যা রাসূল পর্যন্ত পৌঁছেনি,কোন স্তরে বর্ণনাকারীর অনুপস্থিতি বা বাদ যাওয়ার বিষয়, বা হাদীস সনদ পরম্পরায় মুখস্ত না থাকার বিষয়। অথবা মুনকাতি বা মুরসালের বিষয়ে। অথবা খবরে ওয়াহেদ যার মধ্যে আদল হিফয ইত্যাদি শর্তের উপস্তিতি বিদ্যমান তখন একজন এর উপর আমল করলো, কেননা সে মনে করল এটা তার নিকট বিশুদ্ধ পদ্ধতি, অন্যজন এই সব বর্ণিত ইল্লতের কারণে সে আমল করলো না, সুতরাং সেখানে মতানৈক্যপূর্ণ বক্তব্যই এসেছে।

অপরদিকে ফকীহ্ উলামাগণের মধ্যে তাদের মতামতে হাদীসের অর্থ ও তাদের উপযোগ্যতার কারণে বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে। যেমন মুজাবানাহ্[৫], মুখাবারাহ্[৬], মুহাকিলা[৭], মুলামিসা[৮], মুনাবিযা[৯], খারার[১০] এর মাসআলায় তাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে মতানৈক্য হয়েছে। কখনও হাদীস গ্রহণেও শব্দগত মতানৈক্য হয়েছে। একজন গবেষক হাদীসের শব্দকে পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করেছেন। অপর গবেষক তাকে অন্য পরিবর্তিত শব্দ দ্বারা হাদীস গ্রহণ করেছেন। এটা মূলতঃ হাদীস পঠনের এবং উচ্চারণগত কারণে তা হয়েছে। কোন বর্ণনাকারী কোন শব্দকে বাদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন, অন্য বর্ণনাকারী সে শব্দসহ বর্ণনা করেছেন ফলে এখানে মতানৈক্য সংঘটিত হয়েছে। কখনও

www.pathagar.com

কখনও হাদীসের (শানে উরুদ) সংঘটিত হওয়ার কারণের প্রতি লক্ষ্য করে একজন গবেষক অর্থ করেছেন। অন্যজন তা দ্বারা না করে সরল অর্থ করেছেন। ফলে দু'জনের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে।
কখনও বর্ণনাকারী কোন হাদীস পরিপূর্নভাবে শুনে বর্ণনা করেছেন কেউ কেউ আংশিক শুনে বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে গবেষকগণ যেটি গ্রহণ করেছেন সেখানে অন্য গবেষকের গ্রহণকৃত হাদীসের আলোচনায় মতানৈক্য হয়েছে। এক্ষেত্রে দলীলের শক্তিশালী হওয়ার বিষয় নিয়ে মতানৈক্য হয়েছে।
গবেষকগণের নিকট কোন হাদীস বাতিল হয়ে যাওয়া আবার কারো নিকট বাতিল না হওয়া নিয়ে আমলের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে। আমকে খাস করার বিষয়ে, নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট অবস্থার জন্য অথবা এক গবেষক যা জানার সুযোগ পেয়েছেন অন্য গবেষক তা জানার সুযোগ পাননি। ফলে তাদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে।[১১]

৩. বিধি বিধানের মৌলিক পদ্ধতির মাধ্যমে মতানৈক্যের কারণ ঃ

মতানৈক্যের তৃতীয় কারণ হচ্ছে বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যা তারা উসুলুল ফিকহ এর নীতিমালায় বিধিবদ্ধ ভাবে সন্নিবেশন করেছেন। এগুলো বিভিন্ন ধরণ ও প্রকৃতির মাধ্যমে গৃহিত হয়েছে। এসব নীতিমালা মধ্যে জ্ঞানের চর্চা দ্বারা গবেষকগণ তাদের গবেষণা পরিচালনা করেন। একটি আইনের অধীনে একাধিক সম্পূরক বিধিও তারা প্রনয়ন করেন। এই সামগ্রিক বিষয়টি উসুলুল ফিকহ হিসেবে গ্রন্থ ও শাস্ত্র আকারে প্রনীত হয়। যেখানে প্রত্যেক মাযহাবের বিধি ও নীতিগুলো স্ববিস্তারে বর্ণনা করা হয়।
গবেষকগণ তাদের বিভিন্ন মাযহাবে চিন্তা ও গবেষণায় নীতিগত ভাবে মতানৈক্য করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ তারা আল্লাহর নবীর সাহাবীগণের মতামতকে বিচার কার্যের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে অন্য পক্ষ সাহাবীগণের মতামতের উপর আল্লাহর নবীর (সাঃ) সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিয়েছেন অপর দিকে অন্য পক্ষ আল্লাহর নবীর (সাঃ) নিকট থেকে সাহাবীগণ যে সব দলীল তথ্য উপাত্ত পাওয়া গেছে সেগুলোকে নীতিমালার মধ্যে সন্নিবেশন করেছেন। তারা মনে করেছেন মতানৈক্যের ভিত্তিতে এর বাইরে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই।

www.pathagar.com

কিছু কিছু গবেষকগণ তাদের নীতিমালায়া এ নীতি গ্রহণ করেছেন যে, জনগনের স্বার্থ রক্ষার জন্য যেসব বিষয় প্রাথমিক উৎস কোন বিষয় নিষিদ্ধ হোক বা সম্মতি থাকুক সেখানে জনকল্যানের বিষয়কে সামনে রেখে বিধি প্রনয়ন করতে হবে। অন্যরা এ বিষয়ে ছাড় না দিয়ে একে বৈধ মনে করেননি। মতানৈক্যের ভিত্তিতে অনেক নীতিমালার আওতায় বিভিন্ন প্রকার ও প্রকৃতির মাযহাবের মাধ্যমে গবেষকগণ বিধি প্রনয়ন করেছেন। তারা মতপার্থক্য করেছেন সাদ আল যারারীকে গ্রহণ নিয়ে, অগ্রাধিকার নিয়ে, পূর্ব প্রচলিত বিধি নিয়ে, পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাওয়া নিয়ে, সংকোচন নীতি নিয়ে, অথবা কঠোরতর করন নিয়ে, জ্ঞানের চর্চা নিয়ে,অথবা আচার- আচরণ ইত্যাদি নিয়ে।
যেমনিভাবে মতানৈক্য হয়েছে দালিলীক প্রমাণের সংশ্লিষ্টতা নিয়ে। আর দলীল গুলো কোন প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন করা হবে তা নিয়ে মতানৈক্য হয়েছে। এসব দলীলের উপর নির্ভর করা নিয়ে। এক কথায় এসব বিষয় গুলো ফিকহ্ শাস্ত্রের নীতিমালায় মাযহাব গুলোতে শাখা ও উপ শাখা কেন্দ্রীক মতানৈক্য দেখা দেয়।
উপরের আলোচনায় মৌলিকভাবে মতানৈক্যের প্রধান কারণগুলো পেশ করা হলো, যে গুলোতে ফিকহী মাসআলায় তাদেরকে মতপার্থক্যে যেতে বাধ্য করেছে। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে ইচ্ছা করলে তাদেরকে এ সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করা যায়। [১২]

আইয়্যাম্মাগণের জ্ঞানের মতানৈক্য ও তাদের শিষ্টাচার

প্রথম স্তরের সাহাবীগণ এবং তাদের উত্তরসূরী যাঁরা তাবেয়ীন নামে খ্যাত যারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে অনেক বিষয়গুলোতে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়, যাতে তাদের মৌলিকভাবে গবেষণায় নিয়োজিত হতে হয়। তারা কেউই সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হননি। তারা এর মাধ্যমে এমন সব অবদান রাখতে চেয়েছেন যার মাধ্যমে তারা আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত হতে পারেন। তারা ছিলেন উচ্চাঙ্গের প্রশিক্ষণ ও জ্ঞানে পারদর্শী। তারা সকলেই এই মানসিকতা পোষণ করতেন যে, সঠিক বিষয়ে পৌছার জন্য আল্লাহ তাদের তৌফিক দান করেন। তারা সকলেই তাদের মতানৈক্যের ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে উন্নতর সমাঝোতা প্রদর্শন করেন। একে অন্যের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করেছেন। তারা বলতেন সকল মাযহাবই সত্য, সুতারাং যে কোনটিতে আমল করার কোন

www.pathagar.com

অসুবিধা নেই। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অন্যের বিচার ফয়সালাকে মেনে নিতে তাদের কোন কুণ্ঠাবোধ ছিল না। তারা দলীল নিয়ে মতপার্থক্য করলেও তারা এক্ষেত্রে মতামত দিতেন এইভাবে "এটা আমার দৃষ্টিতে অধিক যুক্তিযুক্ত" "এটা অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য," "এটা কিভাবে হতে পারে", "এটা আমার নিকট প্রণিধানযোগ্য নয়," তারা শরীয়াহ'র বিধি-বিধান মানুষের বোধগম্য ও সহজতর করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন যাতে মানুষ সহজতরভাবে সেগুলো পালন করতে পারে। এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সাহাবী (রাঃ) ও তাবেয়ীন (রহঃ) এবং তৎপরবর্তীগণ যারা নামাযের শুরুতে বিসমিল্লাহ্ পড়ার পক্ষপাতি ছিলেন আবার তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ না পড়ার পক্ষে ছিলেন। কেউ বিসমিল্লাহ্ জোরে পড়তেন, কেউ আস্তে পড়তেন। কেউ কেউ ফজরের নামাজে দোয়ায়ে কুনুত পড়তেন, আবার কেউ কেউ পড়তেন না। কেউ কেউ বমি বা কাটার কারণে অজু আবশ্যক মনে করতেন। আবার কেউ কেউ এতে অজু প্রয়োজন মনে করতেন না। অনেকে নারীদের স্পর্শ করার কারণে অজু আবশ্যক মনে করতেন। অন্যরা এর আবশ্যকতা মনে করেননি। কিছু কিছু গবেষক ও ফকীহ্ উটের ও আগুনে স্পর্শকৃত বস্তু খাওয়ায় অজু করা আবশ্যক মনে করেছেন। অন্যরা এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি।

এইসব কারণগুলো ঐ সব গবেষক ও ফকীহ্গণকে একজনের পিছনে অন্যজনকে নামায পড়তে বারণ করতে পারেনি, যেমনিভাবে আবু হানিফা এবং তাঁর অনুসারীগণ, শাফেয়ী (রহঃ) ও অন্যান্য পরবর্তী ইমামগণ মদীনার ইমামগণের পিছনে নামাজ পড়েছেন যারা ছিল মালেকী অনুসারী এবং এমন ইমামগণও ছিলেন যারা ইমামের পিছনে বিসমিল্লাহ্ আস্তে বা জোরে পড়া নিয়ে মতবিরোধ করেন। আবু ইউসুফ (রহঃ) যিনি হানিফী মাযহাবের একজন বড় ইমাম ছিলেন তিনি আল রশীদের পেছনে নামাজ আদায় করেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রক্তপাতের কারনে অজু করার পক্ষে ছিলেন। তাকে এ ব্যাপারে বলা হলো যদি কোন ইমাম যার থেকে রক্ত বের হলো, সে অজু করল না তাহলে কি তার পেছনে নামাজ পড়া হবে। তিনি বললেন কিভাবে? আমি তো ইমাম মালেক ও সায়ীদ ইবনে মুসাইয়াবের পেছনে নামাজ আদায় করিনি।[১৩]

ইমাম শাফিঈ (রহঃ) আবু হানিফার (সমাধিস্থল) কবর দেশের পাশে ফজরের নামাজ আদায় করলেন। কিন্তু দোয়া কুনুত আদায় করলেনা। অথচ দোয়ায়ে কুনুত আদায় করা তাদের নিকট সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন

www.pathagar.com

করা হলো, কি বল? আমি তার বিরোধীতা করব যখন পাশেই আমি অনুপস্থিত। তিনি আরও বললেন, "আমরা সব সময়ই ইরাকীদের মাযহাবের প্রতি সতর্ক"।[১৪]

আর ইমাম মালেক (রহঃ) প্রতিষ্ঠিত করেছেন ইমামগণকে ঐসমস্ত হাদীসের দিকে যা রাসূল (সাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং যেগুলো মাদানী হাদীস নামে খ্যাত। এবং তিনি সনদের দিক থেকেও মজবুত হিসেবে গন্য করেছেন। তিনি উমর ইবনুল খাত্তাবের হাদীস চর্চাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর আব্দুল্লাহ বিন উমরের বর্ণনাকে, আয়েশা (রাঃ) এর বর্ণনাকে, এছাড়া সাতজন প্রখ্যাত হাদীস ও ফিকহ বিশারদের বর্ণনাকে যারা রাসূলের সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন যাঁরা হাদীস বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং একে বিচার ফয়সালা ও বিধি বিধানে প্রয়োগ করেছেন। তিনি দুর্লভ হাদীস সংগ্রহ করনে ব্রতী ছিলেন, এবং একটি নিয়মিত গ্রন্থ আকারে প্রণয়ণ করেন যার নাম 'মুয়াত্তা'। প্রখ্যাত সাহাবীগণের বক্তব্য সংগ্রহ করেন যারা হিজাজবাসী ছিলেন। সে সাথে তিনি দ্বিতীয় স্তরের মুসলিমদের হাদীস বাছাই করার ব্যবস্থা করেন। তিনি তার হাদীস গ্রন্থকে ফিকহ শাস্ত্রের বিষয় ভিত্তিক বিন্যস্ত করে প্রণয়ণ করেন।

আল মুয়াত্তা ইমাম মালেকের (রাঃ) চল্লিশ বছরের গবেষণার ফসল। ইসলামের ইতিহাসে এটি হাদীস ও ফিকহ সমন্বয়ে প্রণীত প্রথমগ্রন্থ। এই গ্রন্থ হিজাজের ৭০ জন হাদীস বিশারদ দ্বারা অনুমোদিত ছিল। এতদসত্ত্বেও খলীফা মানসুর যখন আশা প্রকাশ করলেন যে, তাঁর এই গ্রন্থকে কপি করে বিভিন্ন মুসলিম প্রদেশে প্রেরণ করবেন এবং তারা এর দ্বারা সকল মতানৈক্য দূরীভূত করার জন্য কাজে লাগাবেন। ইমাম মালেক প্রথমেই এর বিরোধীতা করলেন। তিনি বললেন–

"হে আমীরুল মোমেনীন! এটা করবেন না। কেননা তাদের নিকট পূর্ব থেকে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। তারা হাদীস সমূহ শ্রবণ করেছে। বিভিন্ন সিদ্ধান্ত তাদের নিকট আছে। লোকদেরকে তারা যা পছন্দ করেছে তাতে আমল করার সুযোগ দিন। খলীফা তখন বললেন, ইমাম মালিককে আল্লাহ তায়ালা তৌফিক দিয়েছেন এমন বিষয় বলার যা তিনি মঞ্জুর করেন। ইমাম মালেকের এই উপদেশ ছিল বাদশাহর প্রতি, অথচ তাঁর হাদীস গ্রন্থটি ছিল এমন গ্রন্থ তাতে তিনি উত্তম হাদীস গুলো সন্নিবেশন করেন, উত্তম হিফযকে প্রাধান্যদেন এমন

www.pathagar.com

জ্ঞান এখানে সন্নিবেশন করেন যা নিয়ে মদীনাবাসীর মধ্যে কোন মতানৈক্য ছিল না, বরং এটা ছিল তার সময়কালের উত্তম আলিমগণের উত্তম সংগ্রহ।

---

১. আল মাহসুল, উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদেশসূচক 'করো' শব্দটির পনেরটি অর্থ হতে পারে।

২. আত তানবীহ আলা আসবাহিল ইখতিলাফ (৩২-৩৩)।

৩. যেমন এজন্য পড়া যেতে পারে ইবসুস সাইদ আল বাতলাওসী আত তানবীহ আলাল আসবাবিল্লাতি আওজাবাতিল ইকতিলাপু বাইনাল মুসলেমীন ও ইবনে তাইমিয়াহ, রাফউল মালাম আলিল আইম্মাতিল ইলাম।

৪. ইছতিছহাবুল হাল হচ্ছে ঐ হুকুম যা পূর্বে প্রচলিত হয়ে বর্তমান পর্যন্ত চলমান রয়েছে। কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়নি ফলে তা অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

৫. মুজাবানাহ্ বলা হয়েছে গাছের মাথায় খেজুর রেখে ক্রয় বিক্রয় ,আঙ্গুরকে কাল অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়, চাষাবাদ অবস্থায় গমকে ওজন করে বিক্রি করা, কারও কারও নিকট মুযাবানাহ অর্থাৎ মুজাবানাহ যার অর্থ চাষাবাদ অবস্থায় ক্রয় বিক্রয় (আলকামুসল ফিকহী পৃঃ ১৫৮)

৬. *মুখাবারাহ* ঃ কোন জমিনের মালিক কোন কৃষককে চাষাবাদের জমিন দেয়া এই শর্তে যে, সে জমি তাকে আবার ফেরত দেয়া হবে এবং ফসলের অংশ তাকে প্রদান করবে।

৭. *মুলামাসাহ* ঃ এটি একটি ক্রয় বিক্রয় পদ্ধতি, যা জাহেলী যুগ থেকে প্রচলিত ছিল। এর ধরণ হচ্ছে যখন ব্যক্তি কোন মাল স্পর্শ করলো তখন তা তার জন্য নির্ধারিত হয়ে গেল। সে নিতে রাজী হউক বা না হউক। কাপড় ক্রয় বিক্রয়ের বেলায় ক্রটি বেশী হতো।

৮. *মুহাকালাহ* ঃ এটি এক ধরনের ফসল বিক্রি যা এখনও পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। অর্থাৎ বর্তমান সময়ে ফসলকে ভবিষ্যত দামে বিক্রি করা।

৯. *মুনাবাযাহ* ঃ এটি কাপড় বিক্রির একটি ধরন। একজনের কাপড়কে অন্য জনের কাপড়ের সঙ্গে বিক্রি করা অথবা তার দামের সাথে বিক্রি করা।

১০. *আল ঘারার* ঃ এটি এক প্রকারের বিক্রি যার মাল বাস্তবে নেই, চুক্তির সময় উপস্থিত থাকেনা, পরিমান ও জানা থাকেনা,বিক্রেতা নির্দিষ্ট সময়ে তা সরবরাহ করতেও সক্ষম নয়। বা চুক্তির শর্ত পূরণ করতে সে অক্ষম।

১১. রাফউল মালাম আল মাকতাবুল ইসলামী।

১২. এর জন্য দেখা যেতে পারে নাজহাতুল আউলিয়া এবং দায়েরাতুল মা'রিফুল কারনিল ইশরিন।

১৩. এটা ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, ইমাম মালেক ও ইবনে মুসাইয়্যেব রক্তপাতের কারনে অজুর প্রয়োজন মনে করেন না।

১৪. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ পৃঃ ৩৩৫।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

ইমাম মালেকের প্রতি লাইছ ইবনে সাদের পত্র

মতানৈক্যের সুন্দর শিষ্টাচার ও মতপার্থক্যের উত্তম পদ্ধতির উপর একটি বাস্তব ও উন্নত উদাহরণ পাওয়া যায় ইমাম মালেকের নিকট লাইছ ইবনে সাদের প্রেরিত পত্রে। যিনি তৎকালীন সময়ে মিশরের নেতৃস্থানীয় একজন স্কলার ছিলেন। চিঠিতে ইমাম মালেকের সাথে মতপার্থক্য পূর্ন বিভিন্ন বিষয় তিনি তুলে ধরেন। একটি জ্ঞানের যেমন উত্তম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, অন্যদিকে কৃতজ্ঞতা পূর্ণ দিকও ফুটে উঠে। চিঠির পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরলে লম্বা আকৃতির হবে, তাই এখানে খন্ডিত কিছু আলোচনা পেশ করা হলো। চিঠিতে লাইছ ইবনে সাদ বলেন–

আল্লাহ আপনাকে এবং আমাদের ক্ষমা করুন। দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম পরিণতি দান করুন। আপনার চিঠি আমি পেয়েছি। সেখানে আপনার ভাল থাকার খবরে আমি আনন্দিত। আল্লাহর নিকট আপনার দীর্ঘ হায়াত কামনা করছি। আপনি লিখেছেন যে আপনার নিকট এখবর পৌছেছে যে, আমি লোকদের বিভিন্ন বিষয়ে ফতওয়া দিয়েছি যার বিরোধীতা লোকেরা আপনার নিকট করছে,আমি এজন্য নিজের জন্য ভয় করছি যেসব বিষয়ে আমি পূর্বে ফতওয়া দিয়েছি এবং লোকেরা সেগুলোর উপর আমল করেছে। লোকেরা মদীনার অধিবাসীদের অনুসরণ করছিল। যেখানে রাসূল (সাঃ) হিজরত করেছিলেন। যেখানে কুরআন নাযিল হয়েছিল। এসব ব্যাপারে আপনার লেখা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। এখন এমন সব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যাকে আপনি পছন্দ করবেন। আমি কোন লোককে এমন পাইনি যে, ফতওয়ার কারনে তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে। আর আহলে মদীনার উলামাগণের কোন বিষয় আমার নিকট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে কঠিন মনে হয়নি। আর আমি গ্রহণ করেছি ঐক্যমতের ফতওয়াগুলো এজন্য আমি আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করছি। এরপর লাইছ ইবনে সাদ বললেন, আহলে মদীনা তারা প্রথম স্তরের পূর্বসূরী, যারা রাসূলের মাদরাসা থেকে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমে বের হয়ে পড়েন। তারা চেষ্টা সাধনা ও

www.pathagar.com

গবেষণা করেছেন আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহর উপর। এর পর তাবেয়ীগণ বিভিন্ন বিষয়ে ইখতিলাফ করেছেন। যেমন– রাবীয়াহ ইবনে আবদুর রহমান। যার থেকে অনেক বিষয় গ্রহণ করেছি। তিনি তার অনেক গুণ ও যোগ্যতার বিবরণ দিলেন। একবার ইবনে সাদ তার সঙ্গে মতপার্থক্য পূর্ন বিষয়গুলোর বর্ণনা দেন। যেমন মাগরিব ও ইশা একত্র করা সৃষ্টির দিনে। একজন স্বাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা বিচার কার্য পরিচালনা করা; সালাতুল ইসতেসকাহর খুতবা আগে পড়া সহ অন্যান্য বিষয়। এরবার তিনি চিঠির ইতি টানলেন। আর বললেনঃ

আপনার ফতওয়া পাওয়ার পর আমি আমার অনেক সিদ্ধান্তকে প্রত্যাহার করেছি। আমি আপনার দীর্ঘ হায়াত কামনা করি, কেননা আপনার মাধ্যমে লোকেরা এখন সঠিক বিষয় জানার যে সুযোগ পাচ্ছে তা আপনার অনুপস্থিতে তারা হারাবে। আপনি আমাকে লিখা বন্ধ করবেন না। আমাকে আপনার, আপনার পরিবারের বা যে কোন প্রয়োজনে তলব করলে আমি অবশ্যই সাড়া দেব। আমি যখন চিঠি লিখছি তখন আমি ভাল আছি। আল্লাহর শোকর। আল্লাহর নিকট কামনা করছি, তিনি যেন আমাকে উত্তম শোকর গোজারদের মধ্যে গন্যকরেন এবং আমাকে যে নেয়ামত দিয়েছেন তার খেদমত পরিপূর্ণ করে নেন।[১]

এখানে এই দীর্ঘ আলোচনা ও মনোমুগ্ধকর বিতর্কের কথা বলা হয়েছে যেখানে মতানৈক্যের শিষ্টাচার অতিমাত্রায় স্থান পেয়েছে। এই অবস্থার কোন ব্যক্তি এই আদবকে লংঘন করেনি। একমাত্র তখনি এটা শুরু হয়েছে যখন বিভক্তি ও বিভ্রান্তিকর তাকলীদ শুরু হয়েছে। আহলে ইলমগণের বক্তব্যকে যখন জটিল করে ফেলা হয়েছে বা নিজেদের মতো করে প্রচার করা শুরু করেছে, আর ঐসব ওলামাগণ অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর যত প্রকার মতানৈক্য ও বিভ্রান্তি শুরু হয়েছে। এ ব্যাপারে ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন, কিছু তাবেয়ীগণ তাদের উন্নত জ্ঞানের উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন, তারা ইসলামের যাবতীয় বিশুদ্ধতায় মনোনিবেশ করেছিলেন। তারা তৎপূর্ববতী সত্য পন্থাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে সমঝোতার মনোভাব দূরীভুত হওয়ার কারনে সে অবস্থা আর চলতে পারেনি।

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) যথার্থ বলেছেন, দুনিয়ার লোভে উলামাগণ ইলমকে ব্যবহার করেছেন এবং দ্বীনের একত্ববাদের নীতিকে শাসকদের নিকট জিম্মী করে দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

ইমাম মালেক (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন, চার ধরনের লোকদের নিকট থেকে তোমরা জ্ঞান বা ইলম গ্রহণ করবেন না, ১. বোকা ও দরবেশ থেকে ২. তাদের থেকে যা নিজেদের মনগড়া কথা বলে বিদআতের দিকে আহবান করে ৩. যারা মানুষের কথাকে হাদীসের মতো গন্য করে অথচ রাসূলের হাদীসের গুরুত্ব দেয় না ৪. ঐসব লোকদের থেকে যারা জ্ঞানী, বিশুদ্ধ চিন্তার অধিকারী, তারা আল্লাহর ইবাদতও করে কিন্তু তারা যা বলে এবং আমল করে সে সব সম্পর্কে তারা বেখবর থাকে ।[২] তিনি আরো বলেন, এই ইলমে দ্বীন, খবরদার, কোথা থেকে জ্ঞান গ্রহণ করছ তা ভাল করে চিন্তা করলে। আমি ৭০ জন লোককে পেয়েছি যারা রাসূল (সাঃ) বলেছেন বলে মসজিদে নববীতে সাক্ষী দিয়েছেন। আমি কারো থেকে নেইনি যদি সে বাইতুল মালের জন্য বিশ্বস্ত ব্যক্তি হউক না কেন। কেননা এ ব্যাপারের জন্য যদি সে উপযুক্ত না হয়। আমি তাদেরকে এড়িয়ে গেলাম, যতক্ষন না ইবনে শিহাবের দরজায় আমি কান্না করছিলাম বিশুদ্ধ ইলম জানার জন্য তিনি এগিয়ে আসলেন ।[৩]

আবু হানিফা ও মালেক (রহঃ)

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি ফিকহী বিষয়ে বেশী মতানৈক্য হয়েছে দু'জন বড় আইম্মা আবু হানিফা ও মালেক (রহঃ) এর মধ্যে। আর এসব হয়েছে মূলত নতুন বিষয় সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে। তাদের মধ্যে অনেক ব্যাপারে মতপার্থক্য হয়েছে, কিন্তু তারা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বের মধ্যে কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটাননি। কাজী আয়াজ তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মাদারিক এ বর্ণনা করেছেন, একবার লাইছ ইবনে সাদ মালেক (রহঃ) এর সাথে মদীনায় সাক্ষাত করেন, এসময় আবু হানীফাকে তার পাশে দেখলেন। তিনি বললেন কি ব্যাপার আপনার সাথে তো ইরাকী রয়েছে। উত্তরে মালেক (রহঃ) বললেন, তিনি একজন মস্তবড় ফকীহ হে মিশরের অধিবাসী। আমি নিজেই তাকে মিটিং এ আমন্ত্রন জানিয়েছি। "এরপর ইবনে সাদ আবু হানীফা (রহঃ) এর নিকট গেলেন, আর বললেন কতই না উত্তম মন্তব্য করলেন ইমাম মালেক আপনার ব্যাপারে। আমি কোন ব্যাপারে এত দ্রুত জবাব দেয়ার জন্য তাকে ছাড়া আর কাউকে পাইনি এবং সত্যাসত্য বিষয়ের নিষ্পন্ন করার জন্য।"

www.pathagar.com

মুহাম্মদ ইবনে হাসান ও মালেক (রহঃ)

মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আবু হানীফা (রহঃ) এর উল্লেখযোগ্য একজন সহকর্মী ছিলেন। তার মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি মালেক (রহঃ) নিকট হাদীস শিক্ষা করার জন্য গমন করেন এবং তিন বছর অতিবাহিত করেন। তার নিকট মুয়াত্তা শিক্ষা করেন। মুহাম্মদ ইবনে হাসান এবং শাফী কথা বলেন দু'জন ইমাম নিয়ে। মুহাম্মদ বললেন আমার অগ্রজ (আবু হানিফা) আপনার ইমাম (মালেক) থেকে বেশী জানেন। যদি ইমাম মালেক কোন বিষয়ে চুপ করে থাকেন, তাহলে এটা যুক্তিযুক্ত নয় যে, আবু হানীফা চুপ করে থাকবেন আর মালেক সেখানে কথা বলবেন।

ইমাম শাফী উত্তরে বললেন, আমাকে সততার সঙ্গে বলুন, আল্লাহর নবীর সুন্নাহর ব্যাপারে কে বেশী জানেন। মালেক না আবু হানিফা। মালেক (রহঃ) বলে জবাব দিলেন মুহাম্মদ ইবনুল হাসান। এর সাথে তিনি বললেন, কিন্তু আমাদের ইমাম (আবু হানিফা) তথ্য ও তত্ত্ব এবং যুক্তিতে বেশী পারঙ্গম। আল শাফী এ প্রসঙ্গে বললেন, তোমার কথাই ধরা যাক, মালেক অধিক জ্ঞানী আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহতে। তাহলে কথা বলার জন্য তো তিনিই উপযুক্ত। এ কথা শুনার পর মুহাম্মদ বিন হাসান কোন প্রত্যুত্তর করলেন না। [৪]

আল শাফী ও মুহাম্মদ ইবনে হাসান (রহঃ)

ইমাম শাফী বলেন, মুহাম্মদ ইবনে হাসান সহ আমরা দু'জন একদিন কথা বলছিলাম। এর মধ্যে তার ও আমার মধ্যে কিছু কথা বার্তা ও মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। এমন পর্যায়ে উপনীত হলো যে দু'জনের আলোচনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। মুহাম্মদ ইবনে হাসান বললেন, যদি কোন ব্যক্তি আমাদের সাথে মতপার্থক্য করে এবং আমাদেরকে তার ব্যাপারে দলীল প্রমান দিয়ে সম্মত করতে সক্ষম হয় সে হবে ইমাম শাফী। যখন তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো কেন এমন বললেন। সে উত্তর দিয়ে বললো, "কেননা চিন্তার বিশুদ্ধতা এবং বিশ্লেষণ ও জ্ঞানের গভীরতা এত বেশী যে, যখন সে এগুলো পরিষ্কার করে তুলে ধরেন তখন প্রশ্ন করা , উত্তর দেয়া এবং শুনার মধ্যে আর কোন ব্যতিক্রম থাকে না। [৫]

www.pathagar.com

এই ছিল ইখতিলাফের উত্তম নমুনা উম্মাহর আলিমগণের মধ্যে। আমরা সেক্ষেত্রে দেখি কল্যাণকর যুগে মতানৈক্য ছিল পূর্ববর্তীতে পুরোপুরি অনুসরণে। সেখানে আদাবুল নাবুয়াহ বিদ্যমান ছিল। তারা এ বিষয়ে ভবিষ্যত প্রজন্মকে কোনরূপ অযাচিত অবস্থায় না পড়তে হয়। আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা একটি বক্তব্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়– এই মসজিদে (মদীনার মসজিদ) আমি একশ' বিশজন সাহাবীকে জেনেছি যারা আল্লাহর নবীর (সাঃ) সাহাবী ছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ এমন ছিলেন না, যাদের কাউকে আল্লাহর নবীর কোন বক্তব্য সম্পর্কে বা কোন ইস্যুতে সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য বলা হতো, তারা নিজেরা তা করতেন এবং অন্যদের তা বলা হতো, তারা নিজেরা তা করতেন এবং অন্যদের তা করতে বলতেন। অর্থ্যাৎ একে অন্যের মধ্যে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত দিতেন। শেষ পর্যন্ত যে প্রশ্ন করেছিল তার নিকট বিষয়টি সমাধানের জন্য ফিরে যেত।[৬]

মুসলিম ইমামগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগে তাদের নিজেদের মধ্যে জ্ঞানের ব্যাপারে বা কোন জটিল ইস্যু জানা বুঝার ব্যাপারে একে অন্যকে সম্মতি দেয়া বা মেনে নেয়ার ব্যাপারে কোন কার্পণ্য ছিলনা। এই রকম একটি ঘটনায় যাতে লোকেরা সকলে মিলে এক লোককে ইমাম মালেক (রহঃ) এর নিকট একটি মাসআলা জানতে প্রেরণ করলো। লোকটির এই বিষয় নিয়ে ইমাম মালেকের নিকট পৌঁছতে ছয়মাস লেগে গেল। যখন ইমাম মালেকের নিকট বিষয়টি বললো তখন ইমাম মালেক তাকে লক্ষ্য করে বললেন তোমাকে যারা প্রেরণ করেছে তাদের বলো আমার নিকট এ ব্যাপারে কিছু জানা নেই। লোকটি বললো, তাহলে কে জানবে এ ব্যাপারে? এই জ্ঞানের তো একজনেই মালিক তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। এই বলে ইমাম মালেক (রহঃ) কুরআনের আয়াত পড়ে শোনালেন, যা ফিরিশতাদেরকে আল্লাহ বলেছিল সকল বিষয়ের নাম বলে দেয়ার জন্য তারা জবাব দিয়েছিল–

لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَّمْتَنَا

অর্থ ঃ আমাদের কোন জ্ঞান নেই, একমাত্র সেটুকুই যা আমাদের আপনি শিক্ষা দিয়েছেন। (বাকারা : ৩২)

বর্ণিত আছে যে, ইমাম মালেককে ৪৮টি বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি ৩২ টি বিষয়ে জবাব দিয়েছিল আমি এ ব্যাপারে কিছু জানি না। খালিদ ইবনে খোদাশ

www.pathagar.com

বর্ণনা করেন আমি ৪০টি মাসআলা নিয়ে ইমাম মালেকের নিকট গিয়েছিলাম। সেগুলোর মধ্যে তিনি আমাকে মাত্র ৫টি মাসআলার জবাব দিয়েছেন।
ইবনে আজলাল বলতেন, যখন কোন আলিম এই বলে ব্যর্থ হন কোন বিষয়ের জবাব দিতে "আমি জানি না" তখন তার বিচার ফয়সালা স্থগিত হয়ে যায়।

মালেক ও ইবনে উয়াইনাহ্ (রহঃ)

ইবনে উয়াইনা[৭] ছিলেন ইমাম মালেকের খুবই নিকটবর্তী সহযোগী। ইমাম শাফী বলতেন,তারা দু'জন কাছাকাছি জ্ঞানের অধিকারী। যদি তারা দু'জন না হন তাহলে হিজাজের ইলম বাকী থাকত না। এতদসত্ত্বেও বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি (ইবনে উয়াইনাহ) একটি হাদীস বর্ণনা করছিলেন তাকে বলা হলো, আপনার এ হাদীসের বিরোধীতা করেছেন ইমাম মালেক। তিনি বললেন তুমি কি আমাকে ইমাম মালেকের সাথে তুলনা করছো? আমার তুলনা ইমাম মালেকের সাথে তাই যা কবি যারীর বলেছেন-

وابن اللبون إذا ما لز في قرن - لم يستطع صولة البزل القناعيس

"দুই বছর বয়সের একটি উটকে যখন রশিতে বেঁধে ফেলা হয়, তখন সে জীর্ন শীর্ন একটি বৃদ্ধ উটের শক্তির কাছেও হার মানে।"
উয়াইনাহকে বলা হলো, সে কে? অর্থাৎ যার কথা বলা হয়েছে সে ব্যক্তি কে? তিনি বললেন মালেক ইবনে আনাস, তিনি বলেন, তার নিকট ছহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কোন হাদীস পৌঁছায়নি। তিনি ন্যায়পরায়ণতার কষ্টি পাথরে যাচাই করে হাদীস নিয়েছেন। আমি বিশ্বাস করি যে, ইমাম মালেকের ইন্তেকালের পর মদীনার ধ্বংসের কাছাকাছি হবে।[৮]

মালেক ও শাফেয়ী (রহঃ)

ইমাম শাফী বলতেন, মালেক ইবনে আনাস আমার শিক্ষক। তার নিকট থেকে ইলম গ্রহণ করেছি। যদি আলিম হিসেবে তাকে বিবেচনা করা হয় তাহলে তিনি নক্ষত্র। আমার নিকট মালেক ইবনে আনাসের চেয়ে বিশ্বস্ত কেউ নেই। তিনি আরও বলতেন, যখন তোমাদের নিকট থেকে কোন হাদীস আসবে,তা তোমরা বিশ্বাস সহকারে গ্রহণ করবে। কেননা তিনি সন্দেহযুক্ত কোন হাদীসকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল মনে করতেন।[৯]

www.pathagar.com

আহমদ ইবনে হাম্বল ও মালেক (রহঃ)

আবু জাহরাহ আল দামেশকী বর্ণনা করেন: আমি আহমদ ইবনে হাম্বলকে প্রশ্ন করতে শুনেছি সুফিয়ান ও মালেক এর ব্যাপারে তারা দু'জন মতানৈক্য করেন কোন ব্যাপারে ,তাতে তিনি বলেন আমার অন্তরে মালেকই বড় । যদি মালেক ও আওয়ামী কোন হাদীসের ব্যাপারে মতানৈক্য করেন,বললেন আমার নিকট মালেক অগ্রাধিকার হিসেবে গন্য । যদিও আওয়ামী একজন বড় ইমাম । তাকে বলা হলো, ইব্রাহীম নখয়ীকে মালেকের সাথে তুলনা করা যায় যদিও তিনি হাদীস বিশারদ নন । ইবনে হাম্বল বলেন, তার অবস্থানে সে গ্রহণযোগ্য । এরপর কোন হাদীস যা একজন সাহাবী দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে সে ব্যাপারে তার নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন,এ অবস্থায় তাকে ইমাম মালেক থেকে বর্ণিত হাদীস শিক্ষার জন্য বলে দাও ।

ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে আলিমগণের মতামত

শুবা বিন হাজ্জাজ ছিলেন হাদীসের ব্যাপারে মুসলমানদের আমীর । তিনি আবু হানিফা সম্পর্কে বলেন,আমার জানা মতে তিনি আহলুর রায় ছিলেন । তার সাথে অনেক মতপার্থক্য থাকার পরও তিনি তাঁর প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন । তিনি তারও অন্যান্য মতামতের সাথে একটি সুন্দর সমন্বয় সাধন করেছেন । তিনি আবু হানিফাকে বিশ্বাস পরায়ন মনে করতেন । আর তাঁকে (আবু হানিফা) তিনি হাদীস শুনতে অনুরোধ করেন । যখন আবু হানিফার (রহঃ) মৃত্যু সংবাদ তার নিকট পৌছালো তিনি বললেন, কুফা ইলমে ফিকহ তার সাথে চলে গেল । আল্লাহ তাকে এবং আমাদের মাফ করে দিন ।

ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ আল কাত্তানকে জিজ্ঞাসা করা হলো আবু হানীফা (রহঃ) সম্পর্কে তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ তিনি তো সুপারিশ কৃত । আল্লাহ তাকে নিজ ইলম দ্বারা শোভাবর্ধন করেছেন । আমি তার সকল উক্তি অগ্রগণ্য মনে করি এবং সেগুলো আমি আমলে পরিণত করি ।

এতে বুঝা যায়, তাদের মধ্যে যেন কোন মতানৈক্যই ছিল না । তাদের সিদ্ধান্ত যদি ব্যতিক্রম হতো তাহলে অন্য সাথী ইমামের ব্যাপারে ভাল ধারণাই পোষণ করতেন । তার মর্যাদাকে উপরেই রাখতেন । আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারকের নিকট অনেক বর্ণনা রয়েছে যেগুলোতে ইমাম আবু হানীফার প্রশংসা করা

www.pathagar.com

হয়েছে। তিনি সব সময় তাকে প্রশংসা করে কথা বলতেন এবং তার রায়কে সত্যায়ন করতেন। তিনি তাকে উদ্ধৃত করতেন এবং তাকে অগ্রগন্য বলতেন। তিনি তার মসজিদে অন্য কাউকে (মতামত) গ্রহণযোগ্য মনে করতেন না। একদিন ইবনুল মোবারকের মাজলিশে এক ব্যক্তি আবু হানীফা সম্পর্কে সমালোচনা করলেন। তিনি বলেন, চুপ কর। আল্লাহর শপথ! যদি তুমি তাকে দেখতে তাহলে তুমি তাঁর জ্ঞানের ও প্রজ্ঞার শক্তি অনুভব করতে পারতে।

ইমাম শাফী বর্ণনা করেন, মালেক (রহঃ) কে উসমান আল বাত্তী সম্পর্কে। মালেক (রহঃ) জবাব দিলেন, তিনি একজন পারঙ্গম ব্যক্তি ছিলেন। তারপর তাকে ইবনে আবী শাবরামাহ সম্পর্কে বলা হলে তিনি বলেন, তিনিও একজন সক্ষম ব্যক্তি। তারপর তাকে আবু হানিফা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, যদি তিনি তার ইটের তৈরী মসজিদের দেয়ালের নিকট গমন করেন, এবং তিনি আপত্তি জানিয়ে বলেন এটি কাঠের তৈরী, তুমি সত্যিই বিশ্বাস করতে হবে যে, এটি কাঠের তৈরী।[১০]

এখানে আবু হানিফার যুক্তির বড় মাপের জ্ঞানের প্রতি ইংগিত করে তিনি এ মন্তব্য করেন। আল শাফী (রহঃ) আর বলেন, ফিকহ শাস্ত্রের ব্যাপারে লোকেরা শিশুরমত ইমাম আবু হানিফার উপর নির্ভরশীল।[১১]

এইসব আইম্মাহগণের যেসব সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও আলোচনা হতো তা কল্যানই বয়ে আনত। এতে তাদের পরস্পরের প্রতি এমন আন্তরিকতা থাকত যে, এতে আচরনের এমন সীমা লংঘন হতো না যাতে কল্যান বিনষ্ট হতো না। ফজল ইবনে সিনানীকে [১২] জিজ্ঞাসা করা হলো, আবু হানিফার ঘটনাবলী সম্পর্কে বলুন। আবু হানিফা এসেছেন তাদের নিকট চিন্তার মধ্যে ও চিন্তা বহির্ভূত জ্ঞান শিক্ষার জন্য। এমন জিনিস তিনি রেখে যাননি যার ফলে তাদের বিবাদের মধ্যে লিপ্ত হতে হয়।

উপরে যাদের কথা বলা হলো এরা সমলেই আবু হানিফার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন। কিন্তু তাদের মতানৈক্য তাদের সম্পর্কে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। তাদের প্রশংসা করা বন্ধ হয়নি। তারা একে অন্যকে আহলে খাইর অভিহিত করেছেন, এটা সম্ভব হয়েছে এজন্য যে, তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীমত কিছু বলেননি। তাদের বড়ত্বের প্রতি কোন আসক্তি ছিলনা। বরং তারা গোমরাহীর স্থলে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। যদি এই চরিত্র ও শিষ্টাচার না হতো তাহলে এতসব চিন্তা ও গবেষণা কোন ভাবেই পাওয়া যেত না।

www.pathagar.com

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর ব্যাপারে আলিমগণের মতামত

ইবনে উয়াইনাহ একজন মর্যাদাবান ইমাম ছিলেন। তিনি অতি উচ্চ আসনের সম্মানের পাত্র ছিলেন। এতদসত্ত্বেও লোকেরা যখন তার নিকট কোন আয়াতে কুরআনের ব্যাখ্যা জানতে আসতো বা কোন ফতওয়া জানতে চাইত তিনি ইমাম শাফীর নিকট প্রেরন করতেন। আর বলতেন, একে জিজ্ঞাসা কর। তিনি বেশীর ভাগ সময় এই বলতেন এ সময়ে তিনি হচ্ছেন সর্বোৎকৃষ্ট যুবক। আর তার নিকট ইমাম শাফীর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছালে তিনি বলেন, যদি মুহাম্মদ বিন ইদারিস মারা গিয়ে থাকেন তাহলে সময়ের উত্তম মানুষটি মারা গেলেন।

ইয়াইয়া বিন সায়ীদ আল কাত্তান বলতেন, আমি শাফীর জন্য দোয়া করি আল্লাহর নিকট। এমনকি নামাজেও। আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম তিনি ইমাম মালেকের মাজহাবে বড় হন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাকে বিরত করতে পারেনি, যিনি তার পুত্র মুহাম্মদকে ইমাম শাফীর শিষ্যত্ব গ্রহনে অসিয়ত করেন। তিনি বলেন, এই শায়েখের শিষ্য হও। (ইমাম শাফীর) আমি অসুলে ফিকহর এর চাইতে চক্ষুষ্মান লোক আর দেখিনি। পিতার নসিহত অনুকরণ করে তিনি শাফীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আর বলেন, যদি শাফী না হতো তাহলে আমি প্রশ্ন করার কিভাবে জবাব দিতে হয় তা জানতাম না। আমি যা শিখেছি তার মাধ্যমে শিখেছি। তিনি আমাকে কিয়াস শিক্ষা দিয়েছেন এবং তিনি হচ্ছেন সুন্নাহর উত্তরসূরী ও একে বাস্তব জীবনে প্রয়োগের রূপকার। তিনি একজন ভাল ও সত্যবাদী মানুষ ছিলেন। তিনি সুবক্তা ও জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব ছিলেন।[১৩]

আহমদ ইবনে হাম্বল ও শাফী (রহঃ)

আব্দুল্লাহ যিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের পুত্র ছিলেন। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম শাফিঈ কেমন লোক ছিলেন। কেননা আমি আপনাকে তার জন্য অনেক দোয়া করতে শুনি। তিনি বললেন, হে বৎস! তিনি ছিলেন (শাফী) দুনিয়ার জন্য একটি সূর্য তুল্য। মানুষের জন্য নেয়ামত। তুমি কি এ দুটি পুত্রের অধিকারী কোন সম্পূরক লোক বা ব্যক্তিত্ব তাকে ছাড়া পাবে?

সালিহ ছিলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের অপর পুত্র। তিনি বলেন, আমার সাথে ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ীন এর সাক্ষাত হয়। তিনি বলেন এই যে যা করছেন

www.pathagar.com

তিনি কি তোমার পিতা নন। আমি বললাম সে কি করেন? তিনি বলেন তাকে শাফেয়ীর সাথে দেখলাম, আর শাফী আরোহী ছিলেন। আর তাকে তাঁর ঘোড়ার লাঘাম ধরা অবস্থায় দেখলাম। পরে আমি পিতাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, যদি তুমি তাকে পুনরায় দেখতে তাহলে তুমি বলতে হে পিতা, যদি তুমি জ্ঞান আহরণ করতে চাও তাহলে সাওয়ারীর অপর প্রান্তের রিকাব ধর।[১৪]

আবু হুমায়দ ইবনে আহমদ আল বাছরী বর্ণনা করেন একদিন একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় নিয়ে আহমদ ইবনে হাম্বলের সাথে আলাপ হচ্ছিল। উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন আহমদকে বললেন, হে আবু আব্দুল্লাহ এই বিষয়ে কোন ছহীহ হাদীস নেই। তিনি বলেন, যদি এ ব্যাপারে ছহীহ হাদীস না থাকে তাহলে শাফিঈ'র এ ব্যাপারে বক্তব্য আছে এবং তিনি এ ব্যাপারে দলীল প্রমাণ ব্যবহার করেছেন নিশ্চয়ই। আহমদ বললেন, আমি শাফিঈ (রহঃ) কে বললাম আপনি এই মাসআলার কী বলবেন, এবং এ বিষয়ে আপনার দলীল কি? তিনি বলেন হ্যাঁ এ ব্যাপারে হাদীস রয়েছে।[১৫]

আহমদ ইবনে হাম্বল বলতেন, যদি আমরা কোন প্রশ্ন করতাম যাতে আমাদের কোন হাদীসের ব্যাপারে ধারণা ছিলনা। সেখানে আমি বলি, শাফিঈ (রহঃ) বলেন,কেননা তিনি হচ্ছেন ইমাম ও কুরাইশী আলিম।[১৬]

এই ছিল শাফিঈর ব্যাপারে আহমদ ইবনে হাম্বলের মতামত। দাউদ ইবনে আলী আছবিহানী বলেন, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইকে বলতে শুনেছি আমার সাথে আহমদ ইবনে হাম্বলের সাক্ষাত হয় মক্কায়। তিনি বলেন, আমার সঙ্গে চলুন,আমি আপনাকে এমন একজন লোকের সঙ্গে দেখা করায়ে দেব আপনি কখনও এমন লোক দেখেননি। তিনি আমাকে শাফীর সঙ্গেঁ দেখা করালেন। আর একজন যোগ্য ছাত্রের তার শিক্ষকের জ্ঞানের ব্যাপারে চমৎকার সাক্ষী। কিন্তু শাফিঈ তার ছাত্রকে এত জানা ও বুঝার পরও বলতেন, তুমি হাদীস সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশী জান এবং হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান তোমার বেশী। যখন তুমি কোন ছহীহ হাদীস শুনবে তাহলে আমাকে জানাবে চাই তা কুফা বসরা বা শাস দেশের হাদীস হোক। তুমি যেখানে যাবে যদি সেটি ছহীহ হাদীস হয়।

www.pathagar.com

ইমাম শাফেয়ীর নীতি ছিল যখন আহমদ থেকে কোন হাদীস বলতেন, তার নাম বলতেন না। সম্মানের জন্য তিনি এটি করতেন। বরং তিনি বলতেন, 'আমার সঙ্গী থেকে হাদীস শুনেছি আমাকে বিশুদ্ধ ভাবে খবর দেয়া হয়েছে।' এটি একটি দৃষ্টান্ত। যেসব বক্তব্য দ্বারা একটি উন্নততর নীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সব নীতি ইমামগণ তাদের নৈমিত্তিক কার্য প্রণালীতে ব্যবহার করেছেন। তাদের পদ্ধতি ও মতপার্থক্যের এতে যে নজীর পাওয়া যায় তা সত্যিই আশ্চর্যজনক। তাদের মধ্যে ব্যক্তি স্বার্থের কোন উদাহরণই পাওয়া যায় না।

উত্তম যুগের পরবর্তী সময়ের মতানৈক্য ও তার নীতিমালা

ফিকহী মাসআলার ইজতিহাদী নীতিমালা শেষ হয়ে যায় চতুর্থ হিজরী সনের দিকে। ইজতিহাদের সূর্য ডুবে যায়। তাকলীদ নামে অন্ধ অনুকরণ শুরু হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে এর কোন প্রমাণ যায় না যে, কোন ফিকহী মাসআলা অনুমান ভিত্তিক বা কোন ঘটনা প্রবাহ দ্বারা প্রদান করা হয়নি। এবং মাযহাব গত ফতওয়া প্রদান করা হয়নি। একজনের সিদ্ধান্তের উপর অন্য কোন সিদ্ধান্তের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়নি। প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে এসব কিছুই হয়নি। কিন্তু তৃতীয় শতাব্দীতে যে ইজতিহাদ ছিল তার মধ্যে বিভিন্নতা দেখা দেয়। এসময় উলামাগণ পদ্ধতিগত ও নীতিগতভাবে পূর্বের নীতি থেকে বের হয়ে আসে। কিন্ত এ সময়ে তাকলীদ (অন্ধ অনুকরন) ও নীতি বাক্য দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ শুরু হয়নি।

চতুর্থ শতাব্দীর আহলগণের মধ্যে আলিম ও সাধারণ সবই অন্তর্ভূক্ত হয়। সাধারণ লোকদের মধ্য থেকে তারা আহলে ইলেমগণের সাক্ষাতে ধন্য হয়। রাসূল (সাঃ) থেকে যে বিষয় বর্ণিত হয়েছে সেগুলোতে জমহুর উলামা কোনরূপ বিরোধীতা করেনি। যেমন পবিত্রতা, নামায সালাত, সিয়াম ও যাকাতসহ এ জাতীয় মাসআলায়। তারা সে অনুযায়ী আমল করতেন। যদি তাদের সামনে কোন কোন জটিল বিষয় আসত যেগুলোতে তাদের ফতওয়ার দারস্ত হতে হতো। তখন তারা জ্ঞানী আলিমগণের নিকট থেকে সমাধান জেনে নিতেন। সেখানে মাযহাবের কোন আলিমগণ বিভক্ত ছিল না।

www.pathagar.com

এছাড়া বিশেষ আলিমগণও হাদীস নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। তারা হাদীসে রাসূলের সন্ধান পান। সাহাবীগণের আসারও প্রাপ্ত হন। ফলে তারা মুখাপেক্ষী ছিলনা অন্য কিছুর দিকে। কিন্তু যদি কোন মাসআলায় তাদের মন তৃপ্ত হতো না। আর কোনটিকে প্রাধান্য দেবেন তাও নির্নিত হতো না। এই অবস্থায় তারা পূর্বসূরীদের ব্যবস্থার দিকে ফিরে যেত। যদি সে বিষয়ে দুটি বর্ণনা পাওয়া যেত তাহলে অধিক বিশুদ্ধটি তারা গ্রহণ করতো চাই সেটি মদীনার বা কুফার বর্ণনা হতো।

অন্য আরেকটি গ্রুপ যারা কোন সমাধান খুঁজে পেত না তারা তখন তাদের মাজহাবের অধীনে গবেষণা চালাত। ফলে তারা যে গ্রুপের সঙ্গে গ্রুপভূক্ত হয় সেখানে তারা তাদেরকে মাযহাবভূক্ত করে তোলে। ফলে তাদেরকে হানাফী ও শাফিঈ নামে অভিহিত করা হয়। এর ফলে মাযহাবের সঙ্গে এভাবে নিজেদের জড়িয়ে ফেলার পর পরবর্তী সময়কার ঘটনার জন্ম দেয়। আর হাদীসের আহলগণ তাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মাযহাবের সঙ্গে মিলিত হন। যেমন– নিসায়ী, বাইহাকী অথবা খাতাবী, তারা শাফেয়ী মাযহাবের সঙ্গে মিলিত হয়। তখন সব সিদ্ধান্ত নেয়া হতো ইজতিহাদের মাধ্যমে। তখন কোন ফকীহ আলিমই ছিলেন না যারা মুজতাহিদ ছিলেন না।

---

১. চিঠির পূর্ণবিবরণ ইলামুল মু'কীন ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ৮৩-৮৮ দ্রঃ এবং ফিকরুস সামী ১ম খন্ড পৃঃ ৩৭০-৩৭৬ দ্রঃ।

২. এইহয়ায়ে উলুমুদ্দীন ১ম খন্ড, পৃঃ ৪১।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. আল ইনতিকাহ পৃঃ–১৬

৫. আল ইনতিকাহ পৃঃ– ৩৮।

৬. ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন ১ম খন্ড পৃঃ ২৭৯–২৮০।

৭. সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (মৃত্যুঃ ১৯৮ হিজরী) তিনি একজন হাদীস বিশারদ ছিলেন। এছাড়া তিনি একজন ফিকহবিদও ছিলেন। তিনি কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং মক্কায় ইন্তেকাল করেন।

৮. আল ইনতিকাহ পৃঃ ২২

www.pathagar.com

৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৬, ২৩, ৩০ ।

১০. আল ইনতিকাহ্ পৃঃ ১৪৭ ।

১১. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩৬

১২. ফজল বিন মুসা সিনানী খোরাসানের সিনানী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন । তিনি একজন প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য আলিম ছিলেন । তিনি তাবেয়ীন থেকে হাদীস বর্ণনা করেন । ১৯১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন । তার রচিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে ।

১৩. আল ইনতিকা পৃঃ ৭৩

১৪. আদাবুস শাফেয়ী অ মানাকিবুহু পৃঃ ৮৬- ৮৭

১৫. হামিশ আদাবুস শাফেয়ী অ মানাকিবুহু পৃঃ ৮৬

১৬. আল ইনতিকাহ্ পৃঃ ৭৬

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

চতুর্থ শতাব্দীর পরের অবস্থা

গবেষণামূলক বিশ্লেষণ ফিকহ্‌শাস্ত্রে প্রয়োগ চতুর্থ শতাব্দীতে অনেকাংশে শেষ হয়ে যায়। মুসলমানদের মধ্যে এ সময়কালে অন্ধঅনুকরণের প্রবণতা (তাকলীদ) সমৃদ্ধ পর্যায়ে চলে যায়। ফলে পূর্বের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়। ইমাম গাজ্জালী এ সময়ের কথা বর্ণনা করেন ঃ জেনে রাখ, নিশ্চয়ই খিলাফতের সময়কাল রাসূলের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়কাল যাঁরা হিদায়াত প্রাপ্ত। তখন তারা ছিলেন আল্লাহ্ তায়ালার ইমাম ও আলিম হিসেবে পরিচিত। তাঁরা স্বয়ং আহকামের ফকীহ্ ছিলেন। তারা ছিলেন পারদর্শী বিভিন্ন ফতওয়ার ব্যাপারে। তারা ছিলেন ফিকহ্ শাস্ত্রের জীবন্ত প্রতীক যেখানে তারা সমস্যার সমাধান করার জন্য পরামর্শ ভিত্তিক ফিকহী সমাধানের মাধ্যমে ফয়সালা দিতেন। তাদের পর (খোলাফায়ে রাশেদাহ্) মানুষগুলো তাদের রেখে যাওয়া অবস্থাকে ধরে রাখতে পারেনি। বরং সেখানে তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত বিচার ফয়সালাকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়। তারা ফিকহ্ শাস্ত্রের সহায়তা নিতে চেষ্টা চালায়। তারা জন্ম দেয় এমন একটি ইমাম ও ফিকহ্‌বিদগণের মধ্যে বান্দব পূর্ন অবস্থা যার মাধ্যমে একটি সহায়তা চেয়েছিলেন যেন সকল প্রকার আইন কানুন প্রণীত হতে পারে। তারা তাদের পূর্বের প্রজন্মের কিছু আইম্মাগণের সম্পৃক্ততা পেয়েছিলেন। তারা একটি পূর্নাঙ্গ ধর্ম (জীবন ব্যবস্থা) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার মনোবৃত্তি সামনে রেখেছিলেন। তাদেরকে যখন প্রশাসন ও শাসক শ্রেনীর দিক থেকে তাদের সাথে সমঝোতা করার আহবানকে দৃঢ়ভাবে বিরোধীতা করেন এবং তাদের সঙ্গ ত্যাগ করেন। মানুষ সে সময়ে যে বিষয় প্রত্যক্ষ করলো তা হলো, তখনকার শাসকশ্রেনী ও নেতৃত্ব এসব ইমামগণকে গ্রেফতার করা এবং তাদের উপর নানা ধরনের আক্রমনের দৃশ্য। তখনকার শাসক শ্রেনী ইমাম ও আলিমগণের স্তুতি ও প্রশংসা কামনা করত। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা প্রত্যাখ্যান করেন। যারা তাদের সাথে আপোষ করেনি

www.pathagar.com

তারা অপমান ও নিগৃহিত জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছিল। এই অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তাদের তাওফীক দিয়েছেন আল্লাহর দ্বীনকে যথাযথ সংরক্ষন করার। এসময়ে তারা হাত দিয়েছিল ফতওয়া তৈরীকরণের কাজে এবং কঠিন কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল বিভিন্ন প্রদেশ ও এলাকার জনগণের পক্ষ থেকে।

এদের পর একটি সময় আসলো যখন আমীরগণের পক্ষ থেকে লোকেরা প্রবাদ বাক্য আকারে কিছু বিশ্বাসগত বিষয় জানতে থাকল। বিভিন্ন সাংঘর্ষিক বক্তব্য শুনতে থাকলো। লোকেরা তখন ইলমুল কালামের[১] উপর নির্ভরশীল হতে হলো। তারা এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করলেন। জটিল বিশ্বাসগত দিককে খন্ডন করেন। এসময় অনেক বিষয় এসব বক্তব্যের বিপরীতে প্রকাশিত হয়। এগুলো সবই ছিল দ্বীনকে সংরক্ষণের তাগিদে। সুন্নাহকে যথাযথ রাখার এবং বিদআতকে প্রতিরোধ করার জন্য যেমনি ভাবে তাদের পূর্বসূরীরা দ্বীন কে সংরক্ষণের চেষ্টা চালিয়েছিল। মুসলমানেরা তাদের হুকুম আহকাম গুলোকে আল্লাহর সৃষ্টি তত্ত্বদ্বারা সমাধানের চেষ্টা চালায়। তাদেরকে এ ব্যাপারে প্রচুর পরিমানে নসিহত করেন। এরপর প্রকাশিত হয় এমন একটি অবস্থা যারা ইলমে কালামের উপর নির্ভরশীলতা রক্ষা করেনি এবং তখন বিতর্কের দরজা খুলে যায়। তখন অশ্লীলতার দরজা খুলে যায়। রক্তা রক্তির পথে ধাবিত হয়। সমাজে ও দেশে অশান্তির বিস্তার ঘটে। নিজেদেরকে বিতর্কের দিকে ধাবিত করে। প্রথম স্তরে যাদের আলোচনা করা হয়েছে তারা ছিলেন ইমাম আবু হানিফা ও শাফেয়ী (রহঃ) এর মাযহাব। বিশেষ করে তখন মানুষ দ্বীনি ইলম ও ইলমুল কালাম ত্যাগ করে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে। ফলে হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবের লোকেরা এ বিতর্কে বেশী জড়িয়ে পড়ে। এ বিতর্কে এক পর্যায়ে মালেক, সুফিয়ার ও আহমদ ইবনে হাম্বল ও অন্যান্যরা জড়িয়ে পড়ে। তাদের চিন্তা ছিল যে, শরীয়াহর কঠিন বিষয় তারা সনাক্ত করার মাযহাবের বিষয় সমূহের সীকৃতি নেবে। অসুলল ফতওয়াকে বিস্তার করবে। এতে অনেক বিষয় ও গ্রন্থাদী রচিত হয়। বিতর্ক ও গ্রন্থ সমূহের বিস্তারের এ ধারাবহিকতা আজও চলছে [২]। তবে তাদের কেউ দুনিয়ার জন্য এসব করেননি বরং আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তারা এসব কার্যাদী পরিচালনা করেন। আমরা চিন্তাশীলতার মাধ্যমে আলোচনা করলে যা প্রাপ্ত হই তা নিন্মরূপ :

www.pathagar.com

১. ইমাম গাজ্জালী (রহঃ), তিনি তাঁর ব্যবস্থার হাতকে প্রসারিত করেন উম্মাহর আসল ব্যাধির দিকে। যে কারণে তারা তাদের নেতৃত্ব দু'ধরনের ব্যাধিত আক্রান্ত হয়, প্রথম চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে দ্বিতীয়ত রাজনৈতিকভাবে। আমাদের ইতিহাস স্বাক্ষী দেয় যে, অনৈসলামিক পন্থা ও পদ্ধতির রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্থলাভিষিক্ত হয়। তারা যেন আমাদের রাজনৈতিক মর্যাদাকে বেমালুম ভুলে যায়। চিন্তা ও বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে, যা ছিল শুধু মাত্র গ্রন্থ ও বর্ণনার মাধ্যমে, তা আবর্তিত হয় প্রকৃত অভিজ্ঞতা ও মুসলিম উম্মাহর সমস্যা সমাধানের পথ হিসেবে লিখিত বর্ণনা ও বিবৃতি দ্বারা প্রতিদিনের মুসলিম উম্মাহর সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট ছিল না যা সাহাবী ও তাবেয়ীনগণের অনুসরনে করা হচ্ছিল। অধিকাংশ যৌক্তিক সমস্যা এবং অন্যান্য বিষয় যা ইসলামী বিধি বিধানের সাথে সম্পর্ক যুক্ত ছিল। লিখিত বিধি বিধান স্বাভাবিক ভাবে তাদেরকে বিতর্ক তুলনামূলকও যৌক্তিক বিরোধীতার মুখোমুখি করে।

২. এই অবস্থার মধ্যে ফিকহ শাস্ত্রের ধারা প্রকৃতির পরিবর্তন সাধিত হয়। এসময় ফিকহ শাস্ত্র পূর্ববর্তী ধারাকে বিচার বিশ্লেষণ করে মানুষের জীবন মানকে সামনে রেখে শরীয়াহর দাবী পূরন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে একজন বিচারক যাকে আইনসিদ্ধ মনে করত অন্যজন তাকে আইনসিদ্ধ মনে করত না মুসলমানদের মধ্যে এই রকম একটি বিভক্তি তৈরী হলো। স্থান কাল পাত্রের আলোকে। এসময় অসুলুল ফিকহ বিন্যস্ত আকারে প্রণীত হতে থাকে। অধ্যায়কে সুবিন্যস্ত করা হয়। 'আল মাখারিজ ওয়াল হাইল'(৩) নামক অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়। এই নীতিমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সুকৌশলে কোন বিষয়ে এড়িয়ে যাওয়ার বা কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে আইনকে নীতিবদ্ধ করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়।

এই কৌশল ও উদ্ভাবন শক্তি এবং দক্ষতা তাদেরকে ফিকহ শাস্ত্রের এই নীতিমালার আলোকে বুদ্ধিমত্তার যোগ্যতা বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যদের তুলনায় তা খুবই চমৎকার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া হিসেবে পরিগনিত হয়। এই অবস্থায় কিছু কিছু অভিযোগও উত্থাপিত হয়। যেমন শরীয়াহকে অগ্রাহ্য করা, এই নীতিমালার আলোকে শরীয়াহর সীমা অতিক্রম করা,কোন প্রমান ও ইলাল বা দলীল ছাড়া এই কৌশল নীতির আলোকে মাসআলা প্রনয়নের প্রবনতা দেখা দেয়। তারা এমন সব বিষয়ের অবতারণা করে, এমন সব বিধি বিধান প্রনয়ন

www.pathagar.com

করে যা সাধারন মানুষের জন্য প্রযোজ্য ছিল না [৪]। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হচ্ছে, সে সময় যে গুলোতে এ নীতিমালার আলোকে রায় দেয়া হয়েছে।

* যেমন একজন ফকীহকে জিজ্ঞাসা করা হলো, অজু করার বিধান সম্পর্কে স্ত্রীকে স্পর্শ ও পুরষাঙ্গ স্পর্শ করার ব্যাপারে, সে বললেন, ইমাম আবু হানীফার নিকট অজু নষ্ট হবেনা।

* যদি জিজ্ঞাসা করা হতো দাবা খেলা ও ঘোড়ার গোশত খাওয়া সম্পর্কে, বলা হতো এটা ইমাম শাফেয়ীর নিকট হালাল।

* যদি কাউকে প্রশ্ন করা হতো, কি শাস্তি হতে পারে যে, মিথ্যা দিয়েছি বা শরীয়াতের সীমালঙ্ঘন করেছে কোন জুডিশিয়াল বিষয়ে। বলা হতো, এটা মালিক (রহঃ) নিকট বৈধ।

* যদি কোন বিচারককে জানতে চাওয়া হয় কোন উপায় উদ্ভাবনের ব্যাপারে যেখানে কোন ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রির ব্যাপারে, যাতে কোন লাভ হচ্ছে না, উন্নতির সম্ভাবনাও নেই। এর মুতাওয়াল্লী বেঁচে নেই। এটা বিক্রির ব্যাপারে আহমদ ইবনে হাম্বল অনুমতি প্রদান করেন। তিনি এই আইনকে এই হিসেবে বিবেচনা করেছেন যে,এটা মুসলমানদের সেবা মূলক কাজ। যা সবসময় অগ্রগতির দাবী রাখে। কেননা এটা প্রাইভেট সম্পত্তি যা কয়েক বছরের মধ্যে পরিবর্তন হতে পারে। [৫]

এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ ভীতি তিরোহিত হলো এবং শরীয়াহর নীতিমালাকে উপেক্ষা করা হলো। বিষয়টি শেষ পর্যন্ত কবিদের ছন্দে রূপ লাভ করেছে। তারা দেখিয়েছেন আল্লাহর নির্দেশনাকে কিভাবে কুক্ষিগত করা হয়েছে। কবি আবু নাওয়াস বলেন–

رَبَاحُ العِرَاقِيُّ النَّبِيْذُ وَشُرْبُهُ
وَقَالَ حَرَمَانِ المُدَامَةُ وَالسُّكْرُ
وَقَالَ الْحِجَازِيُّ الشَّرْبَانُ وَاحِدٌ
فَحَلَّتْ لَنَا مِنْ بَيْنِ قَوْلَيْهِمَا الخَمْرُ
سَآخُذُ مِنْ قَوْلِهِمَا طَرَفَيْهِمَا
وَأَشْرَبُهَا لَا فَارَقَ الوَازِرُ الوِزْرُ

"ইরাকীদের সহচর হল নাবীজ (খেজুর বিজানো পানি) আর হেরমান বলল এদুটাতো দুধরনের মদের নাম। হিজাজীগণ বলল উভয় পানীয়তো একই

www.pathagar.com

তাহলে তাদের দুপক্ষের কথা অনুযায়ী আমাদের জন্য তো মদ হালাল হয়ে গেল তাদের দুটি কথাকে দুদিক থেকে বিবেচনা করে আমি তা (মদ) পান করব কে পাপী আর কে ভাল তা নির্নয়ের জন্য।"

মূলতঃ এসব কারণে দ্বীন সংরক্ষণের নমুনা বিভিন্নভাবে লংঘিত হয়েছে। সহজ বিষয় কঠিন হয়ে গেছে আর কঠিন বিষয় সহজ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। যেমনিভাবে মালেক আন্দালুসী, যিনি মালেকী মুফতী ইয়াহইয়াহ ইবনে ইয়াহইয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন রোযার কাফফারা সম্পর্কে।

অথচ আলিমগণের দায়িত্বের গুরুত্ব এখানেই নিহিত যে, তারা রিসালাতের তাবলীগ করবে। যেভাবে আল্লাহ তাঁর কিতাবে নির্দেশনা নাযিল করেছেন এবং যেভাবে তার রাসূলকে দিয়ে প্রেরণ করেছেন। সেখানে কঠিন বা সহজ করার কিছুই নেই। কুরআনের ভাষায়ঃ-

"তুমি বলো, তোমরা কি তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালাকে অবহিত করতে চাও, অথচ এই আকাশ মন্ডলী এবং এ যমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালা জানেন। আল্লাহ তায়ালা সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত আছেন। (হুজরাত: ১৬)"

قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ

অর্থ ঃ আপনি বলে দিন এ ব্যাপারে আল্লাহ বেশী জানেন, না তোমরা বেশী জান? (বাকারা ঃ ১৪০)

আয়াত দ্বয়ের শিক্ষাই হচ্ছে এর যথাযথ অনুকরণ করা। এখানে এর অতিরিক্ত কিছু করাই বিদআতের শামিল। চাই তা সহজ করার জন্য হউক অথবা কঠিন করার জন্য হউক।

তাকলীদ ও তার পরিণতি

আমরা দেখলাম উপরের আলোচনা সমূহে কিভাবে ফিকহী ইলমের রাজ্যে নানা কারণ ও প্রকার প্রকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আর এ ক্ষেত্রে নেককার ও সংশ্লিষ্ট মানুষ গুলো স্বীকার করেছেন যে, অযোগ্য লোক সকল নানা ধরনের অনিয়ম দিয়ে গবেষণাকে (ইজতিহাদ) ম্লান করেছে। পরিণতিতে কারণে-অকারণে তারা নিজেরাই নসুস (text) সমূহ নির্ধারণ করে মূল নসুসের উপর প্রাধান্য

www.pathagar.com

দিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করেছে। এ অবস্থায় হক ও সত্যপন্থী মানুষগুলো মুসলিম উম্মাহর গন্তব্য ও ইসলাম সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করেছিলেন যাতে এ ব্যধি থেকে উম্মাহকে মুক্তি দেয়া যায় এবং আসল বিষয় দ্বীনের মধ্যে টিকে রাখা যায় এবং তারা এর জন্য তাকলীদ করাকেই একমাত্র মুক্তির পথ বিবেচনা করলেন। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, এমন কি সমস্যা হয়েছিল যে, তাকলীদ বা অন্ধ অনুকরণ ছাড়া এখান থেকে উত্তরণের আর কোন পথ ছিল না?

ফকীহগণ তাঁদের মধ্যকার বিতর্ক, তাদের বিরোধীতা এবং তাদের পারস্পরিক সমঝোতার বিষয়ে তাদের পূর্ববর্তীগণের এতদসংক্রান্ত উদাহরণের দিকে ফিরে যেতে পারতেন এবং একেই একমাত্র পথ বলে চিহ্নিত করতে পারতেন। কিন্তু মানুষ গুলো তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের পূর্ববর্তীদের সিদ্ধান্ত সমূহের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। পরিনতিতে তারা চার ইমামের একজনের মাযহাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে তাদের কার্যাবলী পরিচালনা করতে থাকে। এ চারজন ইমাম হলেন, আবু হানিফা, মালিক, আল শাফী এবং আহমদ ইবনে হাম্বল। অধিকাংশ মুসলমানেরা এ চার জনের মাযহাবের অধীনে চলে যায় এবং শক্তভাবে তাদের বক্তব্য অনুযায়ী সকল ফয়সালাকে সম্পন্ন করতে প্রত্যয়ী হয়। যদিও তাদের সকল ক্ষেত্রে ফয়সালা বিদ্যমান ছিল না বা মুজতাহিদগণের মধ্য থেকে তাদের সকল বক্তব্যকে সমর্থন যোগ্য নাও বলে থাকেন। ইমাম আল হারামাইন (মৃত্যু: ৪৭৮ হিজরী) অভিযোগ করে বলেছেন, একটি ঐক্যমত্যের সিদ্ধান্ত ছিল বিশেষজ্ঞ ইমামগণের মধ্যে যে, আল্লাহর নবীর প্রখ্যাত সাহাবীগণের প্রতিও কোন তাকলীদ করা যাবেনা। কিন্তু মুসলমানেরা যখন দেখল, চার ইমামের মাযহাবের প্রতি সমর্থন করতে তাদের কোন সমস্যা নেই। কারণ তারা (ইমামগণ) তাদের পূর্ববতী উৎস ও নসুস গুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যাস করেছেন। তারা আরও দেখল যে, ইমামগণ তাদের পূর্ববর্তীদের নীতি ও পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে মাসআলা বিন্যাস করেছেন। সুতরাং তারা (মুসলমানরা) সরাসরি পূর্ববর্তীদের নিকট পর্যন্ত যাওয়া জরুরী মনে করেননি। ইমাম হারামাইন এ ধরনের তাকলীদকে সমর্থন করেননি। অপরদিকে ইমাম হারামাইন এর এই ইজমার সূত্র ধরে ইমাম ইবনে আল সালাহ (মৃত্যু: ৬৪৩ হিজরী) চার ইমামের তাকলীদকে অবশ্যই জরুরী মনে করেছেন। তাদের মাযহাব ও পদ্ধতির অনুসরণ এবং শতাব্দীর স্বাধীনতাকে সমর্থন করা জরুরী মনে করেছেন। এ কারণে যে, সাহাবী ও

www.pathagar.com

তাবেয়ীগণের[৬] মাযহাব দ্বারা এগুলো পূরন করা সম্ভব ছিলনা[৭]। ফলে মুসলমানরা তাদের গ্রন্থাদী, জ্ঞান, বিরোধীতা, বিষয়াবলী সকল কিছুকে বহন করতে থাকে। ফলে এসব জ্ঞান, উদ্ধৃতি, মাযহাব, সমর্থন, ঐক্যমত, বিতর্ক বিন্যাস, ভিন্ন মতামত ভাল ভাবে আঞ্জাম দিতে থাকে।

এই মতানৈক্যের ধারাবাহিকতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেতনা শক্ত ভীতের উপর দাঁড়িয়ে যায় এবং বিস্তার লাভ করে। পরবর্তী শতাব্দী তাকলীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ইজতিহাদ এর বৃক্ষ হুমকীর মধ্যে পড়ে। জাহেলীর অনুপ্রবেশ ঘটে। ফিতনা দানা বেঁধে উঠে। মানুষের দৃষ্টিতে তারাই আলিম ও ফকীহ বলে বিবেচিত হয় যারা ফকীহগণের কিছু বক্তব্য মুখস্ত করতে সক্ষম হয়েছে, সিদ্ধান্তসমূহ সম্বল হিসেবে অধিভুক্ত করতে পেরেছে। তারা তুলনা করতে প্রয়োজন মনে করেনি দুর্বল কি সবল। মুহাদ্দিস বলতে তাদেরকে ধরে নেয়া হতো যারা হাদীসের কিছু মুখস্ত করতে পেরেছে চাই তা শক্তিশালী হৌক বা দুর্বল হৌক।

পরবর্তী উম্মাহর অবস্থা

এই ছিল উম্মাহর অবস্থা যারা তাকলীদের মধ্যে জিম্মী হয়ে পড়লো। ফলে তারা তাদের পূর্ববর্তীদের ঐতিহ্য ও মাহাত্ব বেমালুম ভুলে গেল। তারা সেখানে নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগীয় বিষয় আলাদা করে দেখল। ফলে মানুষ তাদের নিজেদের খুশীমত ব্যবহার করতে থাকল। আর উম্মাহর আলিমগণ এইসব কাজ সুসম্পন্ন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তারা এজন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে, এতে তারা নিরাপদ বোধ করল।

এই ছিল মডার্ন ইউরোপীয়ান উম্মাহর রাজত্ব। তারা দেখল তাদের পূর্ববর্তী সব কিছুই তারা হারিয়ে ফেলেছে,এখন আর কোন সারাংশ বাকী নেই। তারা দেখল মুসলমানদের বিশ্বাস মূল্যহীন হয়ে পড়ে, অধিকাংশ ইমানদার নড়বড়ে, দৃঢ়তা তার স্থানে নেই, ব্যবহার আদর্শচ্যুত, দৃঢ় পদে টিকে থাকার অবস্থা নেই, চিন্তা তিরোহিত, ইজতিহাদ বন্ধ, ফিকহ হারিয়ে গেছে, বিদআত প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ ঘুমন্ত, উম্মাহ যেখানে সেখানে আর নেই।

এইসব অবস্থা যারা উম্মাহ তৈরী করেছে এই অবস্থার জন্য পশ্চিমা শক্তি অধির আগ্রহে অপেক্ষা করেছিল। তারা একে সোনায় সোহাগা (Golden oppprtunity) হিসেবে বিবেচনা করল। তারা মুসলিম উম্মাহকে তাদের মধ্যে

www.pathagar.com

বিলীন করে দিতে এবং ইসলামের সামান্যতম চরিত্রও ধ্বংস করে ফেলতে। এই অবস্থাই যা আজকের দিনে হয়ে চলে তার ধারাবহিকতা মাত্র। এই সময়কালে তাদের বিপর্যয় ঠেকানোর জন্য, হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করেছে। তাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে কেননা আল্লাহর দেয়া আইনের পরিবর্তে এবং স্বাভাবিক অবস্থাকে পরিবর্তন করে সমগ্র ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। যা করা হয়েছে তা অন্ধ অনুকরণে বিদেশীদের ধাঁচে করা হয়েছে।

ইসলামের শত্রুরা বসে নেই। তাদের আভ্যন্তরীন কোন মতপার্থক্যে তারা অন্য কাউকে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দেয় না। বরং তারা তদের সকল উপায় উপকরণ মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে চলেছে। মুসলমানদের শত্রুদের একটি অন্যতম কৌশল হচ্ছে, ভাগ করা ও শাসন করা (Devide and rule) এটা তাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছে মুসলমানদের ইখতিলাফের কারনে। এই সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিভিন্ন পন্থায় মুসলিম উম্মাহ তাদের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উম্মাহর কিছু যুবক ইসলামী দর্শন মতবাদে, কিছু আহলে হাদীস রূপে, কিছু মাযহাবগত দর্শনে বিভক্ত হয়ে চেষ্টা করছে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য। কিন্তু এই সকল ব্যবস্থা ও মতবাদকে পরস্পরের মধ্যে মত বিনিময়ের মাধ্যমে সমস্যার উত্তোরনে উদ্যোগী হচ্ছে না। ফলে সমস্যা তিমীরেই থেকে যাচ্ছে। একনিষ্ট মুসলমানরা তো সংকট উত্তোরণ করতে চেয়েছিল। বর্তমান অবস্থায় তারা অন্তত: দুটি উদ্দেশ্য সফল করতে চেয়েছিল। প্রথমত: পূর্ব ঐতিহ্য ও আদর্শের নূন্যতম স্থাপন করে বাতিল আদর্শ ও ভ্রান্ত প্রভাবকে দূর করে দেয়া। তারা আশা করেছিল এর মাধ্যমে তাদের মন মানসিকতা ও চিন্তা চেতনায় বিশুদ্ধতা আনয়ন করা। এর মাধ্যমে ইসলামের একটি সত্য নীতি ও পদ্ধতি মুসলিম সমাজে বাস্তবায়িত হবে। দ্বিতীয়ত: পৃথিবীতে ইসলামের বিরুদ্ধে নানা প্রপাগান্ডা দূর করে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এটা বড়ই বেদনার কারণ যে, মুসলিম মর্যাদাবানগণ ইসলামের এই মতপার্থক্য ও মত ও পথ থেকে উত্তোরনের কোন পন্থা অবলম্বন করেনি। ফলে ইসলাম বর্তমান সময় পর্যন্ত নানা পথ ও মত দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। আর পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ ও সংশয় দানা বাধতে থাকে। যা মুসলমানদের জন্য বড়ই বেদনা বিদূর পরিস্থিতি ঠেলে দেয়।

www.pathagar.com

এই মতপার্থক্যের ফলে এটি চিরস্থায়ী রূপ লাভ করে। এখানে জোর দেয়া দরকার বিশ্বাসঘাতকতামূলক কর্মকান্ডকে যা ইসলামকে বার বার তার লক্ষ্যে পৌছতে দেয়নি। এই বিশ্বাস ঘাতকতা মুসলমানদের সকল আশা বুমেরাং করে দিয়েছে।

সে কারণে আজকের মুসলমানদের বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে বিশেষভাবে আল্লাহর নিকট দোয়া করা, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে ইসলামের মৌলিক ফজিলতকে বহন করা এবং তার মৌলিক আহবানকে বাস্তবায়ন করা। তাদের মধ্যে সকল মতপার্থক্য দূর করে ফেলা। যদি এটা করা না যায়, তাহলে তাদেরকে আরও দুর্বিসহ জীবনযাপন করতে হবে। আমাদের সত্যবাদী পূর্বসূরীদের শিষ্টাচারকে আমাদের দেখতে হবে। কারণ তাদের মতপার্থক্য কখনও তাদের মৌলিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে বাঁধা প্রদান করেনি। তাদের একনিষ্ঠ মনোবাঞ্ছনা ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। সেজন্য ঐ ধরনের অবস্থা আমাদেরও কামনা করতে হবে এবং আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে।

আজকের মতানৈক্যের কারণ সমূহ

মতপার্থক্যের ধারাবহিকতা এক সময় থেকে পরবর্তী সময়ে নিয়ে যায়। পূর্বের সময়ের সমস্যা পরবর্তী সময়ে স্বাভাবিক ভাবে চলে আসে। এর সাথে আজকের মুসলমানদের মতপার্থক্যের মূল কারণ দুটি: প্রথমত: ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা, দ্বিতীয়ত: জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের পশ্চাৎপদতা।

মুসলমানদের জ্ঞানের রাজ্যে যে বিশালত্ব ছিল, তাতে উপনেবিশবাদী কাফির সম্প্রদায়ের অনুপ্রবেশ ঘটার পর তারা তাতে নানা ক্ষতিকারক বিষয় চালু করে দেয়। তারা চিন্তা করে এই জাতির সব বিষয় পরিবর্তন করে দিতে হবে। তারা প্রথমে হাত দেয় শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। যাতে করে তাদের জ্ঞানের মধ্যে পরিবর্তন এসে যায়। তারা আধুনিকতার নামে এমন চিন্তা চেতনা শিক্ষায় ছদ্মাবয়নে মুসলিমদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় যাতে নতুন চিন্তায় অভ্যস্ত হয় এবং আধুনিকতার সাথে একাকার হয়ে যায়। তাদেরকে উপনেবিশবাদীরা এ ধারণা দিতে সক্ষম হয় যে, তাদের মত করে শিক্ষাগ্রহণ করলে তারা তাদের মত জ্ঞান বিজ্ঞান ও উন্নতি অগ্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারবে। এর মাধ্যমে তারা ইহুদীদের ও নাসারাদের গীর্জার কাছাকাছি চলে যায়। আর এর মাধ্যমে অথ্যাৎ

www.pathagar.com

তাদের ধর্মের কাছাকাছি নেয়ার মাধ্যমে এমন একটি জিঞ্জিরে মুসলমানদের আবদ্ধ করেছে যে, মুসলমানদের সবকিছু যেন তারা পরিবর্তন করতে পারে। কুরআনুল কারীমের ভাষায়–
"এটা সত্যিই বড়ো একটি কঠিন কথা যা তাদের মুখ থেকে বের হচ্ছে আসলে তারা মিথ্যা ছাড়া কিছুই বলেনি।" (কাহাফ : ৫)
এই অবস্থার কারণে এবং তাদের সাথে মুসলমানদের সাথে তাদের ভ্রান্ত ধর্মের এ সম্পর্কের কারণে ইসলামের সাথে তাদের একনিষ্ঠ বিশুদ্ধ হওয়া দূরীভুত হয়ে যায়। অথচ এটি আল্লাহর নির্দেশ। ফলে ইসলামের ও রিসালাতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয় এবং আল্লাহর নুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।
অধিকাংশ মুসলিম দেশ সমূহে তারা অতিদ্রুত এমন একটি ইসলামী শিক্ষার দিকে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করল যাতে মুসলিম ঐতিহ্যের মৌলিকত্ব বলতে কিছু না থাকে। উপনেবিশ বাদী কাফিররা এমন একটি অবস্থার শিক্ষা ব্যবস্থা চাইল যেমন মাটি থাকবে কিন্তু ঐ মাটি থেকে কোন উৎপাদন না থাকে। অর্থাৎ শিক্ষা থাকবে স্কুল কলেজ ছাত্র- শিক্ষক সবই থাকবে কিন্তু শিক্ষা হবে এমন ভাবে যাতে সেখানে থেকে কোন চেতনাবাহী লোক বের না হয়। সেজন্য তারা ইসলামী শিক্ষা বলতে কতিপয় বইপত্র এবং আরবী ভাষা শিক্ষাকে মূল বলে ধারণা প্রদান করে। অথচ প্রকৃত অবস্থা এর সম্পূর্ন ভিন্ন। তারা শিক্ষার মাধ্যমে এমন গ্রুপ বের হওয়া বন্ধ করে দিল যারা শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনে কিছু করতে সক্ষম হবে এবং তাদের বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটাতে পারে। মুসলমানদের সম্ভাবনার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তারা আত্মনির্ভরশীলতা হারিয়ে ফেলল। তাদের ব্যক্তিগত মান দুর্বল হয়ে পড়ল। এই শিক্ষার মাধ্যমে তারা কেবল মাত্র ধর্মীয় পদবী গুলোতে যোগদান করার জন্য অফিসিয়াল সেট আপ তৈরী করে দিল। ফলে মুসলমান শিক্ষিতদের সমাজের মূল অবকাঠামোতে অবদান রাখবার সকল দরজা বন্ধ হয়ে গেল।
তারা ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান আহরণে ব্যর্থ হয়। যাতে করে তাদের মিশন ও স্বমহিমাকে ভাস্বর করতে পারে। এর ফলে ইসলাম সম্পর্কে তাদের জ্ঞান সীমিত ও খন্ডিত হয়ে যায়। তাই তারা ইসলামকে এক গ্রুপ অন্ধের মত আন্দাজ অনুমান করে। যে অন্ধরা একটি হাতীর বিভিন্ন অংশে হাত রেখে নিজেদের মত করে হাতির বর্ণনা দিতে থাকে। এই হচ্ছে মুসলমানদের অবস্থা ইসলাম সম্পর্কে তাদের জানা ও বুঝার আজকের অবস্থা।

www.pathagar.com

মুসলিম উম্মাহ্ ইতিমধ্যে বহু ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ল। এক গ্রুপ তাদের পূর্ব ঐতিহ্যের দিকে ফিরে যেতে চায় আর পূর্ব পশ্চিমা ধাঁচ বজায় রেখে ইসলামকে নাম সর্বস্ব করে টিকিয়ে রাখতে ও তৎপর হয় কেউ কেউ। এরা হলো দুদোল্যমনা মুসলমান। তারা এত ভীত হয়ে পড়ল যে, ইসলামের সাথে তাদের সম্পর্ক ততটুকু রাখল যাতে তারা নিজেরা নিরাপদ বোধ করে। মুসলমানদের অন্য দল যারা উৎসুকতার সাথে ইসলামে প্রকৃত ভাবে ফিরে আসতে চায়। কিন্তু তারা একা একা বিভিন্ন পথ ও অবলম্বনে সেখানে ফিরে যেতে চায়। ফলে তাদের মধ্যে বহু মতানৈক্য ও মতপার্থক্য তৈরী হয়ে চলেছে। তাদের জন্য একটাই সহজ কাজ যে, শত্রুদের জন্য দোয়া করা। সারা বিশ্বের সকল গ্রুপকে শাসক শ্রেনী ঘেরাও করে রেখেছে এবং তাদের বের হওয়ার কোন পথ বাকী রাখেনি। সে বেষ্টনীর মধ্যে তারা নিরবে নিভৃতে শেষ হয়ে যাচ্ছে নিজেদের সংশোধন করার এবং আলোকোদ্ভাসিত পথ খুঁজে পাওয়ার পূর্বেই তাদের সম্বল নিঃশেষ হয়ে গেছে।

মুক্তির পথ

এখন আমাদের আলোচনা করা দরকার ঐ যে ব্যাধি দীর্ঘ সময় থেকে মুসলিম উম্মাহকে পেয়ে বসেছে যা সনাক্তও করা হয়েছে, আমরা সে গুলোর সংশোধন করা এবং ঐ ব্যাধি সমূহের একটি চিকিৎসা কোর্স সামনে নিয়ে আসা জরুরী। *প্রথমতঃ* একনিষ্ট মুসলমানদের উপর এটা এখন জরুরী যে, তারা ইসলামকে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য কাজ করবেন। যারা গভীর ভাবে এর মর্মবেদনা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন তাদের মধ্য থেকে একদল যুবককে একাজে লাগাতে হবে। তাকে শরীয়াহ বিজ্ঞানে বুৎপত্তি অর্জন করতে হবে। এই শিক্ষা দান কার্যক্রম করতে হবে তাদের মাধ্যমে যারা গভীর জ্ঞানে পারদর্শী শরীয়াহ বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান রাখেন। এবং যারা বিষয় সম্পর্কে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। এই স্কলারগণ অবশ্যই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক গৃহিত নীতিমালার আলোকে তাদের শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। এই শিক্ষাদান প্রাপ্ত যুবকদের একই সঙ্গে সমসাময়িক জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। এই দু'ধরণের জ্ঞানের সমন্বয়ে তারা আশা করা যায় ইসলামের বিশুদ্ধ করণ প্রক্রিয়া ও উম্মাহর অগ্রসর করার বিষয়ে তারা অবদান রাখতে পারবে। এই প্রক্রিয়ার তাদেরকে

www.pathagar.com

নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। মানবতার নমুনা পেশ করতে হবে। দিনের পর দিন এভাবে অবস্থার অবশ্যই উন্নতি হবে। মনে রাখতে হবে, ইসলাম ছাড়া মানবতার বিজয় কিছুতেই সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ মুসলমানরা চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী সংকটে বসবাস করছে। তাদের মধ্যে এদের সংখ্যা অত্যন্ত সমস্যা। মুসলমানদের চিন্তার ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে। এ ব্যাপারে সমস্যা মুসলমানদের জন্য এ জন্য যে, উম্মাহর সকল প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে তাদের আদর্শ উদ্দেশ্য লক্ষ্যচ্যুত হয়ে গেছে। তাদের পূর্বসূরীদের রেখে যাওয়া সম্পদ যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া যায়নি। নিম্ম মানের লোকেরা জ্ঞান ও প্রশিক্ষনের দায়িত্ব পালন করেছে। মুসলমানদের পরস্পরের প্রত্যয় বিনিময়ের যথাযথ ব্যবহার করা যায়নি। মুসলিম ওয়ার্ল্ডের প্রায় নেতৃত্ব দুর্নীতি ও আত্মম্ভরীতায় মেতে উঠেছে। এই সব ঘটনাবলী মুসলমানদের জন্য একটি দল তৈরী করতে হবে। মুসলিম ওয়ার্ল্ডে ইসলামের আদর্শিক যে সংকট চলছে তার সমাধান করতে হবে। অমুসলিমগণ ইসলামের আসল রূপ দেখতে পারছে না ফলে তারা ইসলামকে নিয়ে ভাবতে পারছে না বা তারা বিরুপ মন্তব্য করছে। কিন্তু আসল অবস্থা বর্তমান থাকলে অবস্থা তো থাকতোই না বরং দলে দলে ইসলামেই অনুপ্রবেশ করতো।

আজ এর বহু প্রমাণ আছে যে, মুসলিম বিশ্বের শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গুলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্যবাদী, ব্যালেঞ্জ মুসলিম ব্যক্তিত্ব উপাদনে ব্যর্থ হয়েছে। তারা ইউনিভার্সিটি গুলো পাশ্চার্ত্যের দৃষ্টি ভঙ্গি সামনে রেখে সাজিয়েছেন। কিন্তু তাদের বিষয়টির কি হবে তা তারা চিন্তা করেননি। এই বিশেষজ্ঞ ও চিন্তাবিদ বুদ্ধিজীবীগণ চেষ্টা করবেন যত দ্রুত সম্ভব এই শিক্ষিত যুবকদের ইসলামের জরুরী বিষয়গুলোতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায়, যাতে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য এবং গুণ ও বৈশিষ্ট্য তাদের মাধ্যমে বিকশিত হতে পারে। ইউনিভার্সিটি যে প্রজন্ম বের করে দিচ্ছে তাদের চিন্তা ধারা ইসলাম সম্পর্কে অতি দুর্বল। তাদের চিন্তার মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আছে।

তারা সক্ষম নয় তাদের জ্ঞানকে মুসলিম উম্মাহর সেবায় নিয়োজিত করতে। ফলে তাদেরকে যে অবস্থায় নিয়ে আসতে হবে। শিক্ষা মূলক ইনষ্টিটিউট যেগুলো ইসলামের জন্য পরিধি যেমন আল আজহার এবং অন্যান্য ইউনিভার্সিটি ও কলেজ ইনস্টিটিউট উম্মাহর উন্নয়নে সে গুলোর ইতিপূর্বেকার সাফল্য ছিল সীমিত আকারের। তারা ইতিপূর্বে কিছু শরীয়াহ ভিত্তিক বিজ্ঞানী

www.pathagar.com

তৈরী করত যা অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করতে তৈরী করতে এগুলো ব্যর্থ হয়েছে। এই সব বিশেষজ্ঞ সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ সমূহের মোকাবেলা করতেও সক্ষম নয়। যার ফলে মুসলিম উম্মাহর চিন্তা ও অন্তরে যত প্রকারের দুর্বলতা ও সন্দেহ প্রবেশ করে তাদের ধ্বংসের মুখোমুখি করেছে। এই অবস্থায় মুসলমানরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক এর্ব অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা অযোগ্যতার পরিচয় দেয়। ফলে অন্যান্য জাতিগুলো করছে তার অনুকরণে কিছু করার বা আমদানী করার চেষ্টা চালায়।
এই অন্ধগ্রহণ করার প্রবণতা ও অভ্যাস স্বাভাবিক ভাবে তাদের মতানৈক্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। উম্মাহর কার্যক্রম বিভিন্ন শাখা-উপশাখার যা বিস্তার লাভ করে। আর এই মতানৈক্য প্রকারান্তরে পশ্চিমা চিন্তা-চেতনায় করা হয়েছে যাদেরকে একধরনের পশ্চিমাদের কৃতদাসে পরিনত করেছে। এটা এজন্য মূলতঃ কেননা বিশেষজ্ঞগণের সংশয় ও সন্দেহ এবং পূর্ণাঙ্গ ও আংশিক ব্যর্থতা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিধি বিধান ও নীতিমালা গুলোতেও প্রভাব বিস্তার করেছে।
এখন আমাদের এমন একটি চিন্তার দিকে ধাবিত হতে হবে যে, যার মাধ্যমে ইসলামের অন্তর নিহিত বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। আর সকল বিষয়গুলো দুটি ক্রিয়ামূলের মত সাজাতে হবে। কুরআনুল কারীম ও আল্লাহর নবীর সুন্নাহ। এমনি ভাবে আমাদেরকে পূর্বসূরী সালফে সালেহীনগণের উত্তম যুগের অনুসন্ধান করতে হবে তারা কুরআন ও সুন্নাহকে কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন। মোটকথা উম্মাহকে ইসলামের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এমন অবস্থায় উপনীত হতে হবে যে, ইসলামই বাচাঁর একমাত্র পন্থা। সকল বিপদে ইসলামই একমাত্র ভরসা। এই ধরনের ইসলামী দৃঢ় বিশ্বাস মুসলমানদের বহন করতে হবে তাদের চিন্তা ও চেতনার মাধ্যমে। যখন উম্মাহ এই অবস্থায় উপনীত হবে সঠিক ও দৃঢ়ভাবে, যদি এগুলো সঠিক ভাবে করা যায় তাহলে কল্যানকর সময় আসা খুব দূরের কিছু নয়।

www.pathagar.com

শেষ কথা

আলোচনা পর্যালোচনা শেষে আমাদেরকে কতিপয় বিষয় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা দরকার সেগুলোর মধ্যে–

১. মুসলমানদের গুরুত্ব প্রদান করা কুরআনুল কারীমের ব্যাপারে। যা আল্লাহ তায়ালা সহজ করে দিয়েছেন শিক্ষা ও অনুধাবনের জন্য। আমাদের জন্য একে বুঝার জন্য প্রশস্ত রাস্তা রয়েছে সুন্নাহর মধ্যে যেখানে শ্রেনী বিন্যাসিত জ্ঞান বিদ্যামান রয়েছে। সেজন্য এগুলো জানা বুঝার নিয়ম কানুন আমাদের জানতে হবে। শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ বের করে নিতে হবে। আর কুরআন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় জানতে হবে। জানতে হবে সুন্নাহকে। জানতে হবে নাসিখ মানসুখ, আম- খাস, এমন আম যার উদ্দেশ্য খাস হয়ে থাকে, মতলক ও মুকাইয়্যাদ এবং অন্যান্য বিষয়াবলী। এগুলো ছাড়া আলো লাভ করা সম্ভব নয়, হেদায়াত প্রাপ্ত সম্ভব নয়। জ্ঞানও লাভ করা যায় না। আল্লাহ হেফাজত করুন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন– যে ব্যক্তি জ্ঞান ব্যতিত কুরআন সম্পর্কিত কোন কথা বলবে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে তৈরী করে নেয়[৮]। সুতারাং কুরআন ও সুন্নাহকে বুঝার জন্য এক দুটি বই পড়াই যথেষ্ট নয় বরং এর সমগ্র নিয়মকানুন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা জরুরী।

২. এ কথা সম্পর্কে ভাল করে সতর্ক হতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা শরীয়াহ নাযিল করেছেন মানুষকে দু'জাহানের জন্য তৈরী হতে দুজাহান হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাত। আর বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য যা তাদের জন্য ভাল এবং শক্তি সামর্থকে নিরুপণ করার জন্য যা আল্লাহ তাদের জন্য নেয়ামত হিসেবে দান করেছেন। এই কারনে আল্লাহ সমস্ত মাখলুকাতের উপর তাদের সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এই শরীয়াহকে মানুষের কোন জটিলতা রাখা হয়নি। যেমন কুরআনের ভাষায়:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

অর্থ ঃ আর তোমাদের দ্বীনের মধ্যে কোন জটিলতা রাখা হয়নি। (সুরা হজ্ব : ৭৮)

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তায়ালা সহজ করে দিয়েছেন তার বান্দাদের জন্য যেন তারা দ্বীনের মাধ্যমে পারস্পরিক ছায়ার নীচে বসবাস করতে পারে। সেখানে কোন কঠিনতা থাকবেনা, থাকবেনা কোন বাড়াবাড়ি।
আল্লাহ্ বলেন –

يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ করে দিতে চান, কঠিন করতে চান না। (বাকারা:১৮৫)

يُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ

অর্থঃ আল্লাহ্ তোমাদের বিপত্তিকে সহজ করে দিতে চান। (নিসা ঃ ২৮)
আল্লাহ্ তার বান্দাদের দুর্বলতাকে গ্রহণ করেন। যেমন বলা হয়েছে–

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

অর্থ ঃ মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল করে। (নিসা ঃ ২৮)

শরীয়াহ সকল আহকাম গুলোতে মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। শরীয়াহ মানুষের প্রয়োজনে, আল্লাহর প্রয়োজনে নয়। কারণ আল্লাহ তো চির ধনাট্যা ও চির প্রশংসিত। সুতারাং শরীয়াহ সকল দিক বিভাগকে ভাল করে জানা ও বুঝার কোন বিকল্প নেই। মৌলিক নীতিমালা জানাই যথেষ্ট নয়, আর শাখা-প্রশাখাও জানার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী।

এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনুল বুরহান বলেন, আল্লাহ্ তার বান্দাদের জন্য রাজনৈতিক আইন দান করেছেন। সময়ের বিবর্তনে মানুষের ধরণ ও প্রকৃতি বিভিন্ন হবে। প্রত্যেক সময়ের জন্য এর ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা রয়েছে। এবং তাদের নির্দিষ্ট কল্যান রয়েছে। প্রত্যেক জাতির শিক্ষণীয় রয়েছে, যদিও তা অন্য জাতির জন্য ধ্বংসের কারণ হতে পারে।[৯]

উম্মতের আলিমগণের উক্তিতে ঐক্যমত্য রয়েছে আহকামে শরীয়াহর ব্যাপারে। বান্দাদের কল্যানের ব্যাপারে, আল্লাহ্ তাদের জন্য যা দিয়েছেন তা সকলের তরে সমভাবে প্রযোজ্য। আর যে সব ক্ষেত্রে পরিষ্কার দিক নির্দেশনা নেই সেখানেও আল্লাহর হিকমত বিদ্যমান রয়েছে। আর এই কারণে

www.pathagar.com

ইজতিহাদী হুকুম সমূহে সময়ের সাথে সাথে তা পরিবর্তিত হতে পারে। ব্যক্তির কারণে হতে পারে, পারে শক্তি সামর্থ ও পাত্রের পরিবর্তনের কারণে।

এইভাবে আমাদের জন্য জরুরী যে, আমরা কিতাব ও সুন্নাহকে জানব, এর মধ্যে অকাট্য দলীল রয়েছে তা কুরআনুল আজীম ও মুতাওতীর হাদীস। এর অন্যদিক থেকে বিবেচ্য সুন্নাহ রয়েছে যেমন খবরে আহাদ, সাথে গবেষণা মূলক অন্যান্য দিক বিভাগ রয়েছে সেগুলোও আমাদের জন্য অতীব জরুরী। কারণ আল্লাহ যিনি তার বান্দাদের জন্য সহজ করার পথ খোলা রেখেছেন। এগুলোর নিরীখে মানুষের কল্যান নিশ্চিত করা সম্ভব, যাতে কুফুরী, ফাসেকী বা বিদআতের পর্যায়ে যেতে হয় না।

৩. মুসলমানদের জরুরী করণীয় বিষয়ের মধ্যে রয়েছে সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করা। মুসলমানদেরকে সারিবদ্ধ করা একনিষ্ঠভাবে। তাদেরকে সকল দুর্বলতা থেকে মুক্ত করা এবং ক্ষতি কারক দিক থেকে মুক্ত রাখা। ইবাদাতগুলো যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো নির্নয় করা এবং নৈকট্য লাভ করা উত্তম নৈকট্য যা এই ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে অর্জিত হবে এবং এর উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তার রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন করা। মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বে ভাঙ্গন সৃষ্টি অথবা তাদের সিদ্ধান্তে মতানৈক্য এমন একটি বিষয়ের দিকে যা অবৈধ হয়ে যায়। অথবা তাদের একত্রে থাকাকে বাধাগ্রস্ত করে। মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব আল্লাহর জন্য হবে। তাদের মনের ঐক্য সাধিত হবে। এটি অগ্রগণ্য একটি কাজ; কেননা তা তাওহীদের জন্য জটিল উৎস। এটি আমাদেরকে সামনে অগ্রসর হতে বাধা প্রদান করে। এজন্য আমাদের পূর্বসূরীরা তারা অনেক ছাড় দিয়েছেন অনেক বিরোধীতা থেকে বের হয়ে এসেছেন। আমাদেরকে সে গুলোতে বিশ্লেষণ করে চলতে হবে।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন, মুসলমানরা একমত যে, নামাজ বৈধ একজনের পেছনে অন্য জনের। যেমনিভাবে সাহাবা, তাবেয়ীন এবং তার পর চার ইমামগন করেছেন। তারা একজন অন্য জনের পেছনে নামাজ আদায় করেছেন। যারা এর অস্বীকার করবে তারা বড় পথ ভ্রষ্টতায় নিপতিত, তারা কিতাব ও সুন্নাহ বিরোধী এবং মুসলমানদের ইজমা বিরোধী। সাহাবী ও তাবেয়ীগনের কেউ কেউ বিসমিল্লাহ পড়তেন আবার কেউ কেউ পড়তেন না। এতদসত্ত্বেও একজনের পেছনে অন্যজন নামাজ পড়েছেন। যেমন আবু হানিফা ও তাঁর সাথীগণ, শাফিঈ ও অন্যান্যগণ নামাজ পড়েছেন মদীনার মালেকী

www.pathagar.com

ইমামের পেছনে। তারা বিসমিল্লাহ্ পড়তো না জোরে বা আস্তে। এভাবে আবু ইউসুফের সঙ্গে মালেকের মত পার্থক্য হওয়ার পরও তারা একজন অন্যজনের পেছনে নামাজ পড়েছেন।

এসব প্রমাণ আমাদেরকে যে কোন অবস্থাতেই ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা যোগায়। সুতরাং ঐ ধরনের মতপার্থক্য পূর্বসূরীরা ভাল করে অনুধাবন করেছেন।

৪. আদর্শগত দিক ও প্রকৃতিগত অবস্থা ঃ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পূর্বসূরীদের কৃত ভাল কার্যক্রম পরবর্তীদের জন্য বয়ে নিয়ে আসে। তাতে সময় ও পাত্র ভেদে অনেক বিষয়ে অপকারিতা হিসেবে চিহ্নিত হয় পরবর্তী সাহাবীগণের নিকট।

উপরের এই বক্তব্যের আলোকে জনগণের নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত সামর্থ, প্রকৃত অবস্থা, ইসলামের প্রকৃত আদর্শ নিরূপণ করে ফলাফল অর্জন করা একেবারে সহজ কাজ নয়। এটি ইসলামের অনুমোদন, মানবতার সামর্থ এবং তার বিস্তার ও প্রসার করা ব্যক্তি থেকে অন্যদের পর্যায়ে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এটি আনুগত্য ও ইবাদতের একটি দিক বিশেষ। এর প্রতিধ্বনি ও ফলাফল হিসেবে জান্নাতের যাওয়ার জন্য মুমিনদের রাস্তা সুগম করে দেয়। এর সংক্রান্ত একটি কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে জারীর আল তাবারী আলোচনা করেন যে, কিছু মিশরীয় লোক আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের সাথে দেখা করেন এবং আমরা লক্ষ্য করছি কুরআনের কিছু বিষয় মানা হচ্ছে আর কিছু বিষয় মানা হচ্ছেনা। অর্থ্যাৎ কেউ মান্য করছে আর কেউ মান্য করছেনা। আমরা চাচ্ছি আমিরুল মোমেনীন হযরত উমরের সাথে সাক্ষাত করে এর সমাধান নিতে। পরে তারা আব্দুল্লাহর সাথে সকলে তার নিকট গমন করেন। উমর (রাঃ) কে আব্দুল্লাহ ঘটনা বলার উপর উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে কাছের একজনকে উমর (রাঃ) বললেন, "আমাকে সত্য করে বল। আল্লাহর নামে শপথ করে বল তোমরা কি পুরো কুরআন পড়? সে বললো হ্যাঁ। উমর (রাঃ) বললেন তাহলে কি তোমরা পুরো কুরআনের সব মানো? সে বললো হে প্রভু! না। তোমরা যা দেখছো তাতে কি তোমরা কুরআনের পুরোপুরি কঠিন মান্য করছো ? পদক্ষেপ গুলো কুরআন অনুযায়ী গ্রহণ করছো। এভাবে উমর (রাঃ) উপস্থিত সকলকে কিছু প্রশ্ন করলেন।

www.pathagar.com

অতপর উমর (রাঃ) বলেন উমর তার মায়ের জন্য কুরবানী হোক। তোমরা যদি আমাকে বল! আল্লাহর কিতাবের পরিপূর্ণ অনুকরণীয় হতে নিঃসন্দেহে আমরা সেখানে ব্যর্থ হবো। এবং সাথে সাথে তিনি কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করেন। আর বলেন–

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

অর্থ ঃ যদি তোমরা বড় গুণাহ থেকে বেঁচে থাকো, আমরা তোমাদের সকল (অন্যান্য) গুণাহ ক্ষমা করে দেব এবং তোমাদের সম্মানিত স্থানে প্রবেশের ব্যবস্থা করব। (নিসা:৩১)

অতপর (রাঃ) তাদের বললেন, শহরবাসীরা (মিশরের) কি জানে তোমাদের আগমনের খবর। তারা বললো না তিনি বললেন, যদি জানতো উদাহরণ হিসেবে একে পেশ করতাম। উমর (রাঃ) এখানে একটি উত্তম উদাহরণ ও শিক্ষা পেশ করেছেন। আমরা বড় গুনাহ থেকে বেচেঁ থাকতে সচেষ্ট হলে একটি বিচ্যুতি অনায়াশে দূর হবে এবং উম্মাহ কল্যানের মধ্যেই অবস্থান করবে। সেদিকেই আমাদের ঐক্য বদ্ধ ভাবে নজর দেয়া উচিত।

৫. পূর্ববর্তীদের জ্ঞান ও সমঝোতা এবং তাদের মতানৈক্যের কারণগুলো আমাদের ফিকহী মাসআলার দলীল ও সহায়তাকারী দলীল। এর দ্বারা আমরা বর্তমানের মতানৈক্যের কারণগুলো দূর করতে পারি এবং আমাদের কার্যক্রমকে উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য সামর্থবান হতে পারি। সাথে মতানৈক্যের সমাধানের জন্য উত্তম নীতিমালা হিসেবে ব্যবহার করতে পারি।

পূর্ববর্তীরা মতপার্থক্য করার ক্ষেত্রে যথাযথ কারণ নিয়ে করেছেন। তারা ছিলেন সকলে মুজতাহিদ। তারা যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন। তারা বিশ্লেষণধর্মী ও চিন্তার মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ফয়সালা দিতে সক্ষম ছিলেন। তারা সত্যকে উদঘাটনে সব সময় ব্যস্ত ছিলেন। তারা সত্য ঘটনার জন্য মতানৈক্য করেননি। এসব দিকও আমাদের সামনে রাখতে হবে।

৬. মুসলমানদের সহায়তায় ও উন্নয়নে এবং কঠোর ভাবে মতানৈক্যের নীতিমালা মেনে চলতে আমাদের এর ক্ষতিকারক দিকে এবং এসবের উৎস ও কারণ চিহ্নিত করতে হবে। ইসলামের দাওয়াতের সৌন্দর্য বিনষ্ট করা যাবে

www.pathagar.com

না। যেসব মতানৈক্য ও মতপার্থক্য সদাচারন ও মুসলমানদের সহাবস্থানের বিরোধী এবং ইসলামের শত্রুদের উপকারে আসে তা করা যাবে না।

৭. উপরের এসব বিষয়ে আমাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ভাবে আল্লাহর প্রতি গভীর ভীতি ও ভয় প্রদর্শন (তাকওয়া) করতে হবে। এজন্য তার একনিষ্ট সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে মতানৈক্য ও মতৈক্য উভয় ক্ষেত্রে। এব্যাপারে আমাদের কঠিন প্রত্যয় দরকার। ব্যক্তিগত চিন্তা চেতনা বাদ দিয়ে ইসলামকে ভাল করে অনুধাবন করা দরকার। বর্তমান মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে প্রচুর হুমকির মধ্যে রয়েছে। তাদের ভোগান্তি হচ্ছে চরম। সেজন্য বর্তমানে আমাদের কুরআন ও সুন্নাহকে অনুকরণ করতে হবে। তাহলে মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন এবং উম্মাহকে সংশোধনে রাস্তা দেখাবেন। সকল ভুল ভ্রান্তি ও ক্ষতিকারক দিক থেকে তাদের নিরাপত্তা দেবেন।

আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, আমাদের উপকারী বিষয় শিক্ষা দেয়ার, আমাদের জন্য জ্ঞানের প্রসারতার, সত্যের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হবার, সত্য পথে পথ দেখাবার, আমাদের সফলতার জন্য ক্রন্দন করার তাওফীক দেয়ার জন্য। আমাদেরকে শক্ত ও মজবুত বন্ধনীর মধ্যে তিনি হেফাজত করার ব্যবস্থা তা তিনি তার কুদরত দ্বারা সংরক্ষণ করবেন। সকল প্রশংসা ও ধন্যবাদ একমাত্র মালিকের যিনি পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি এবং পৃথিবীর নিয়ন্ত্রক।

www.pathagar.com

---

১. *ইলমুল কালাম* ঃ এটি হচ্ছে ইলমুল আকীদাহ ও একত্ববাদের বিদ্যা। একে ইলমুল কালাম দ্বারা এজন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, এখানে জটিল আলোচনা স্থান পেয়েছে। এখানে এর প্রবক্তাগণ বিভিন্ন বিশ্বাসগত বিষয়কে উপস্থাপন করে বিরোধীদের সকল সন্দেহের জবাব দিয়েছেন। তাদের দাবীকে খন্ডন করা হয়েছে।

২. ইহইয়াহে উলুমুদ্দীন, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪১ চতুর্থ অধ্যায়।

৩. *আল মাখারিজ ওয়াল হাইল ঃ* এটি আবু হানিফার একটি অসুল বা নীতিমালা। তার মাযহাবে এটিকে মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এ সম্পর্কিত একটি বই মুহাম্মদ ইবনুল হাসান রচনা করেন। এছাড়া একটি গবেষণা পত্র তৈরী করা হয় মুহাম্মদ বুহাইরী কর্তৃক যার নাম দেন আল হাইয়াল আশ শরীয়াহ আল ইসলামিয়াহ।

৪. সালাম মাদকুর, আল ইজতিহাদ ফিল ইসলাম (৪৫০-৪৫১) ও অসুলুল আহকাম (৩৯০)।

৫. সাকীব আরসালান, আল ইরহিসামাতিল লুতাফ।

৬. আত তাকরীর ওয়াত তাহরীর তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ৩৫৩

৭. প্রাগুক্ত এবং ব্যাখ্যা গ্রন্থ আত তাওহীদ তুহফাতুল মুরীদ - ১৫২।

৮. তিরমিযী ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন বিশুদ্ধ সনদে আল জামিউস ছাগীর ২য় খন্ড পৃঃ ৩০৯।

৯. কিতাবুল অসুলে ইলাল অসুলি।

www.pathagar.com

BIIT AT A GLANCE

Bangdesh Institute of Islamic Thought (BIIT) is a think- tank which engaged in research and indepth study for synthesizing education, culture & ethics. It was established in the year 1989 as a non-government research organisation with the following programs -

- **Research :** In order to identify the Islamic approach in different disciplines of higher education, BIIT conducts the research programs under the supervision of senior faculties of Public Universities.
- **Translation :** In order to publicise the ideas and thoughts of major scholars of the world, BIIT took an initiatives to translate the major books of major scholars written in Arabic and English.
- **Publication :** BIIT publishes the original writings, research works, translation work and seminar proceedings which are used as reference for teachers, students, researchers and thinkers.
- **Library Service** : BIIT has a good number of rare books and journals including the publications of IIIT, USA. These books and journals are preferentially issued to readers of different professionals, university teachers, students and researchers.
- **Supplying the Materials** : One of the major Program of BIIT is collection, preparation and supplying of study materials on National, International and Ummatic Issues.
- **Series of Seminar & lecture** : From the very beginning BIIT is working for organizing the seminers, symposiums, workshops, study circles, discussion meetings etc related to thoughts on education, culture and religion.
- **Exchange Program :** To exchange the informations, Ideas and views, BIIT organizes the partnership program with related organizations and individuals at home and abroad.
- **Distribution of Publications :** In order to dissmination of knowledge, BIIT distributed the publications of IIIT and BIIT to the concerned organizations and individuals.
- **Training & Workshop :** BIIT is conducting the different types of training on research methodology, english & arabic language course etc so that the concerned can perform their activities more efficiently & skilfully.
- **Dialogue & Roundtable discussion :** Dialogues on national & Internationl issues particularly Inter-faith issue, socio-economic issue are arranged by BIIT

www.pathagar.com

- ◆ আত-তাওহীদ : চিন্তাক্ষেত্রে ও জীবনে এর অর্থ ও তাৎপর্য *ইসমাইল রাজী আল ফারুকী* ১৭৫/-
- ◆ ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ *ড. আব্দুলহামীদ আহমাদ আবুসুলায়মান* ৩০০/-
- ◆ ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক — *ড. আব্দুলহামীদ আহমাদ আবুসুলায়মান* — ২৫০/-
- ◆ মুসলিম মানসে সংকট — *ড. আব্দুলহামিদ আহমেদ আবুসুলায়মান* — ১৫০/-
- ◆ জ্ঞানের ইসলামায়ন — *ড. আব্দুলহামিদ আহমেদ আবুসুলায়মান* — ৩০/-
- ◆ ইসলামের দন্ডবিধি — *ড. আব্দুলহামিদ আহমেদ আবুসুলায়মান* — ২০/-
- ◆ ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ — *ড. এম উমর চাপরা* — ২০০/-
- ◆ ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন — *ড. এম উপর চাপরা* — ২০০/-
- ◆ রাসূলের (স:) যুগে মদীনার সমাজ (১ম খণ্ড) — *ড. আকরাম জিয়া আল আমরী* — ৫০/-
- ◆ রাসূলের (স:) যুগে মদীনার সমাজ (২য় খণ্ড) — *ড. আকরাম জিয়া আল আমরী* — ১৭০/-
- ◆ রাসূলের (স:) যুগে নারী স্বাধীনতা (২য় খণ্ড) — *আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ* — ৩০০/-
- ◆ রাসূলের (স:) যুগে নারী স্বাধীনতা (৪র্থ খণ্ড) — *আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ* — ৩০০/-
- ◆ কোরআন ও সুন্নাহ: স্থান-কাল প্রেক্ষিত — *তাহা জাবির আল আলওয়ানী ও ইমাদ আল দীন খলিল* — ৫০/-
- ◆ ইসলামে উসূলে ফিকাহ — *ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী* — ৭০/-
- ◆ ইসলামী শিক্ষা সিরিজ (১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড একত্রে) — *ড. জামাল আল বাদাবী* — ৩০০/-
- ◆ মুসলিম নারী-পুরুষের পোশাক — *ড. জামাল আল বাদাবি* — ২০০/-
- ◆ রাষ্ট্রবিজ্ঞান : ইসলামী প্রেক্ষিত — *অধ্যাপক আবদুর রশিদ মতিন* — ১৭৫/-
- ◆ প্রশাসনিক উন্নয়ন : ইসলামী প্রেক্ষিত — *ড. মুহাম্মদ আল বুরে* — ৩০০/-
- ◆ শিক্ষক প্রশিক্ষণ : ইসলামী প্রেক্ষিত — *ড. এম. জাফর ইকবাল* — ১৫০/-
- ◆ উন্নয়ন ও ইসলাম — *প্রফেসর খুরশিদ আহমেদ* — ৩৫/-
- ◆ তাফসীর সাহিত্য ও সাহিত্যিক — *প্রফেসর ড. রশীদ আহমদ কালন্ধরী* — ১০০/-
- ◆ ইসলামের দৃষ্টিতে নারী — *বি.আইশা লেমু ও ফাতিমা হীরেন* — ৫০/-
- ◆ ইসলামী অর্থনীতিতে পণ্য বিনিময় ও স্টক এক্সচেঞ্জ — *এম আকরাম খান, এম রকিবুজ জামান* — ৭০/-
- ◆ লোক-প্রশাসন : সংগঠন, প্রক্রিয়া ও অনুচিন্তা — *প্রফেসর আবদুন নূর* — ২০০/-
- ◆ ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট — *প্রফেসর ড. আবদুর রহমান আনওয়ারী* — ২০০/-
- ◆ ইসলামী জীবনবীমা : বর্তমান প্রেক্ষিত — *কাজী মো: মোরতুজা আলী* — ১৭৫/-
- ◆ ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা-সামাজিক প্রেক্ষাপট *এম রুহুল আমিন অনূদিত* — ১৩০/-
- ◆ আমাদের সংস্কৃতি — *প্রফেসর মো: জয়নুল আবেদীন মজুমদার সম্পাদিত* — ৬০/-
- ◆ গণতন্ত্র ও ইসলাম — *এম. আবদুল আযিয সম্পাদিত* — ১২০/-
- ◆ সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম — *এম. আবদুল আযিয সম্পাদিত* — ১০০/-

www.pathagar.com

Bangladesh Journal of Islamic Thought (BJIT)
Edited by *Prof. Dr. UAB Razia Akter Banu* 100/-

Book

- Medical Education *Prof. Dr. Omer Hasan Kasule* 200/-
- Medical Ethics *Prof. Dr. Omer Hasan Kasule* 50/-
- Islam in Bengali Verse *Poet Farruk Ahmed* 100/-
- A Young Muslim's Guide to Religions in the World
Prof. Dr. Syed Sajjad Husain 250/-
- Civilization and Society *Dr. Syed Sajjad Husain* 300/-
- Guidelines to Islamic Economics, Nature, Concept and Principles
Prof. M. Raihan Sharif 350/-
- A Dynamic Analysis of Trade and Development in Islam Countries
Prof. Dr. Masudul Alam Chowdhury 350/-
- Origin and Development of Experimental Science
Prof. Dr. Muin-Ud-din Ahmad Khan 120/-
- On Openness, Integration and Economic Growth
Prof. Dr. M. Kabir Hasan 200/-
- Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid
Prof. Dr. Md. Athar Ali 250/-
- Social Laws of Islam *Shah Abdul Hannan* 40/-
- Accounting, Philosophy, Ethics and Principles
M. Zohurul Islam FCA 200/-
- Al-Zakah : A Hand Book of Zakah Administration
M. Zohurul Islam FCA 250/-
- Islamization of Academic Discipline
Edited by M. Zohurul Islam FCA. 150/-
- An Analysis of History of the Socio-Economic Thought
M. Zohurul Islam FCA. 100/-
- Interfaith Relation : National & Regional Perspective
Edited by M. Zohurul Islam FCA. & M. Abdul Aziz 100/-
- Leadership : Western and Islamic
Dr. M. Anisuzzaman & Prof. Zainul Abedin Majumder 70/-
- Man and Universe *Major Md. Zakaria Kamal* 200/-
- Islamic Theory of Jihad and International System
Dr. *Md. Moniruzzaman* 200/-

A Thematic Commentary of the Qur'an
Dr. Shaikh Muhammad Al Ghazali 450/-
Forensic Psychiatry in Islamic Jurisprudence
Dr. Kutaiba S. Chaleby 500/-
Islam and the Economic Challenge
Dr. M. Umer Chapra 800/-
Missing Dimensions in the Contemporary Islamic Movements
Dr. Taha Jabir Al-Alwani 150/-
Laxity, Moderation & Extremism in Islam
Aisha B. Lemu & Fatema Hiren 150/-
Feminism vs Women's Liberation Movements
Abdelwahab M. Almessiri 150/-
Toward Islamic Anthropology
Akbar S. Ahmed 200/-
Islam & Other Faith
Dr. Ismail Raji Al-Faruqi 1,000/-
Crisis in the Muslim Mind
Dr. AbdulHamid A. AbuSulayman 400/-
Wholeness & Holiness in Education
Zahra Al Zeera 550/-
Contemplation : An Islamic Psycho-spiritual Study
Malik Badri 250/-
Rethinking Muslim Women & the Veil
Katherine Bullock 600/-
The Qur'an & Politics
Eltigani Abdelgadir Hamid 500/-
Vicegerency of Man
Abd al Majid al Najjar 250/-
Social Justice of Islam
Deina Abdelkader 500/-
Economic Doctrines of Islam
Irfan Ui Haq 600/-
Islamic Jurisprudence
Dr. Taha Jabir Al-Alwani 200/-
Towards Understanding Islam
Abul A'la Mawdudi 250/-
Forcing God's Hand
Grace Halsell 300/-
National & Internationalism in Liberalism Marxism & Islam
Dr. Tahir Amin 250/-

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

ড. ত্বাহা জাবির আলওয়ানী কায়রোর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট। তিনি Graduate School of Islamic and Social Sciences (GSISS), USA-এর প্রেসিডেন্ট। তিনি Fiqh Council of North American-এরও প্রেসিডেন্ট। এছাড়া তিনি OIC Islamic Fiqh Academy, USA এরও একজন সদস্য এবং International Institute of Islamic Thought (IIIT), USA-এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। তাছাড়া তিনি বহু বই-এরও লেখক। তাঁর উলেখযোগ্য বইসমূহের মধ্যে আছে Usul al Fiqh al Islami; Source Methodology in Islamic Jurisprudence; The Ethics of Disagreement in Islam; Ijtihad এবং The Qur'an and the Sunnah; The Time Space Factor.

অনুবাদক পরিচিতি

ড. আ.ই.ম নেছার উদ্দিন একজন প্রথিতযশা অনুবাদক, লেখক, গবেষক ও সম্পাদক। পেশাগত জীবনে ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমীর প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ফারইষ্ট লাইফ বার্তা নামক ত্রৈমাসিক (বুলেটিন) পত্রিকার তিনি সম্পাদক। এছাড়া তিনি গবেষণা ম্যাগাজিন মাসিক 'চিন্তাভাবনা'র সম্পাদক। শিক্ষকতায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ড. নেছার উদ্দিন ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে কৃতিত্বের সাথে সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ইসলামী শিক্ষার ওপর গবেষণা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি সম্পাদনার ওপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং পেশাগত বিষয়েও একাধিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন, বেশ কয়েকটি সেমিনার ও ওয়ার্কশপে তিনি যোগদান করেন।

বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থেকে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিষদ বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট এর আজীবন সদস্য, ইসলামিক থ্যটস নামক বি আই আই টির গবেষণা পত্রিকার সম্পাদনা পরিষদের সদস্য, ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরোর ফেলো এবং বাংলাদেশ মানবাধিকার কাউন্সিল এর যুগ্ম মহাসচিব হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর একজন প্যানেল গবেষক। বেশ কয়েকটি মুল্যবান গ্রন্থের তিনি লেখক, সম্পাদক ও অনুবাদক। পত্র-পত্রিকায় তার শতাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার ১ নং আমানুল্যাপুর ইউনিয়নের করিমপুর গ্রামের অধিবাসী আলহাজ্ব মাওলানা শফিক উল্যাহ ও মনোয়ারা বেগমের দ্বিতীয় পুত্র। বর্তমানে তিনি একাধিক গবেষণা কর্মের সাথে সম্পৃক্ত।

ISBN
984-70103-0015-3